নারীর কথা

NARIR KATHA

THE HUNGER PROJECT

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

নারীর কথা ৭

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১২ উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদনায়
ড. বদিউল আলম মজুমদার

৮ মার্চ, ২০১২

THE HUNGER PROJECT
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

নারীর কথা ৭

সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক নাছিমা আক্তার জলি

নির্বাহী সম্পাদক তাসমিয়া ফয়েজ

বিশেষ কৃতজ্ঞতা মুর্শিকুল ইসলাম

প্রকাশক দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ
৩/৭ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮১১-২৬২২, ৮১২-৭৯৭৫
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১১-৬৮১২

প্রকাশকাল মার্চ ২০১২ খ্রিস্টাব্দ/ফাল্গুন ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

কপিরাইট দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

মুদ্রণ ইনোসেন্ট প্রেস
১৩২, আরামবাগ, ঢাকা
ফোন: ০১৮১৯২৩৯১৭৫

Narir katha 7
Collected writings on the occasion of International Woman's Day

ISBN 978-984-33-5029-9

Published by :
The Hunger Project-Bangladesh
3/7 Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207
Tel: 811-2622, 812-7975 Fax: 811-6812
E-mail: thpb@bangla.net
Web: www.thpbd.org, www.thp.org/Bangladesh

সম্পাদকীয়

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এর পেছনে রয়েছে নারীর অধিকার আদায়ের এক অবিস্মরণীয় সংগ্রাম ও ইতিহাস। এই সংগ্রাম ও ইতিহাস সুদীর্ঘ হলেও প্রাপ্তি খুবই স্বল্প। দুঃখজনক হলেও সত্য, নারীরা এখনো নানাভাবে বৈষম্যের শিকার। গ্রামীণ নারীরা চরমভাবে বৈষম্যের শিকার। উন্নয়নের ধারায় গ্রামীণ নারীদের সম্পৃক্ততা থাকলেও তাদের অবদান সমাজে পুরোপুরি স্বীকৃত নয়। সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই সঙ্কট বিরাট অন্তরায়। তাই গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। এবারের মূল প্রতিপাদ্য **"গ্রামীণ নারীকে ক্ষমতায়িত করি –ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত দেশ গড়ি"**।

নারীর ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রন অর্জন করে। পিতৃতন্ত্র এবং সকল প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সকল কাঠামোয় নারীর বিরুদ্ধে বিরাজমান জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে। আর এর মাধ্যমেই নারীদের জন্য সুযোগ হয়।

তথ্য-প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ, মাতৃত্বকালীন সুবিধাসহ নানা ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীরা বেশি বঞ্চিত হচ্ছে। এরমধ্যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন যেন তাদের নিত্য সঙ্গী। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হলেও মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় তারা এখনো শতমাইল দূরে পড়ে রয়েছে। এই সকল বাধা থাকার কারনে গ্রামীণ নারীরা পিছিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিতে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকা গুরত্বপূর্ণ। ঘর-গৃহস্থালীর কাজের সঙ্গে পরিবারের সচ্ছলতার জন্য নানাধরণের আয়মুখী কাজ করে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে দেশব্যাপী। গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে উঠান বৈঠক, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ-এর আয়োজন করে

তাদেরকে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত এবং সংগঠিত করছে। এছাড়াও নারীদের অগ্রগমনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে এডভোকেসি করছে।

উজ্জীবিত ও প্রশিক্ষিত নারীরা তাদের নিজেদের উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরশীল জনপদ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সচেষ্ট ও সক্রিয়। **নারীর কথা** এই সকল প্রচেষ্টা ও দৃষ্টান্তেরই প্রামাণ্য দলিল। ২০০৬ সালে এই ধারাবাহিক প্রকাশনার প্রথম সংকলনটি বের হয়েছিল। এবার ১৫ জন নারীর সাফল্যের কাহিনী নিয়ে প্রকাশিত হলো **নারীর কথা**-৭। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে যারা সাফল্যের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন, সাফল্যগাঁথা লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশাকরি প্রতিকূলতাকে জয় করে সফলতার দিকে অগ্রসর হওয়া সফল নারীদের এ গল্পগুলো অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে। গল্পগুলোতে সফল নারীদের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। প্রকাশনার বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর 'বাংলা বানান-অভিধান' অনুসরণ করা হয়েছে। আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও কিছু মুদ্রণজনিত ও আনুষঙ্গিক ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। অনিচ্ছাকৃত এই সকল ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশাকরি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর

ড. হালিমা খাতুনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯৩২ সালের ২৫ আগস্ট বৃহত্তর খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার বাদেকাড়াপাড়া গ্রামে হালিমা খাতুনের জন্ম। পিতা মৌলভী আব্দুর রহিম কলকাতার আলীয়া মাদ্রাসা থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ধর্মশাস্ত্রে তিনি যেমন পন্ডিত ছিলেন তেমনি ছিলেন গজলে দক্ষ। অত্যন্ত উদারমনা এই শিক্ষক নিজের ছেলে-মেয়েদের জন্য আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। গ্রামের মোল্লাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মেয়েদের তিনি স্কুলে ভর্তি করেন ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। হালিমা খাতুনের মা দৌলতুন্নেসার কণ্ঠে ছিল অজস্র বাংলা প্রবাদ, ছড়া ও কবিতা।

পিতার প্রতিষ্ঠিত গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করে হালিমা খাতুন বাগেরহাট মনোমোহিনী উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে মেট্রিক, বাগেরহাট প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, বি.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাশাস্ত্রে এম.এড. করেন। হালিমা খাতুন ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যান এবং সেখানকার ইউনিভার্সিটি অব নর্দান কলোরাডো থেকে ১৯৬৮ সালে ডক্টরেট ইন এডুকেশন ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৬৯ সাল হালিমা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্টে যোগ দেন। পরবর্তীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন। এরইমাঝে কয়েক বছরের জন্য তিনি ইউনেস্কোর উপদেষ্টা হিসেবে নেপালের 'ইক্যুয়াল এক্সেসেস অব উইম্যান টু এডুকেশন'- নামক প্রকল্পে কাজ করেন।

ড. হালিমা খাতুন স্কুলজীবন থেকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও পরে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি অন্যদের সঙ্গে পুলিশের ব্যারিকেড অমান্য করে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল নিয়ে আমতলার মিটিং থেকে বের হন। এটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এরপরে দীর্ঘকাল ধরে ভাষা আন্দোলনসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসীম নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করে যান। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, ১৯৫৩ সালে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী বেগম নুরজাহান মোর্শেদের পক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন ও মুসলিম লীগের পতন ঘটাতে সক্ষম হন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হালিমা খাতুনের লেখিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে একজন কথাসাহিত্যিক হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি শিশুতোষ সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হন এবং শিশু সাহিত্যিক হিসেবে প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। তাঁর কৃতিত্বের অবদান স্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার ছাড়াও নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যা বিনোদিনী সাহিত্য পুরস্কার, সুন্দরবন সাহিত্য সম্মেলন স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের সাহিত্য পদক, খুলনা লেখিকা সংঘ পুরস্কার ও খুলনা জেলা শতবার্ষিকী পদক লাভ করেছেন। হালিমা খাতুনের প্রকাশিত শিশু সাহিত্যের সংখ্যা বিশেরও অধিক। এরমধ্যে আছে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'সোনাপুতুলের বিয়ে', 'হরিণের চশমা'। শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'বাচ্চা হাতির কান্ড', 'সবচেয়ে সুন্দর', 'হঠাৎ খুশী', ইত্যাদি শিশু মনোতোষ রচনা। ছোট শিশুদের জন্য তাঁর রচিত 'পাখির ছানা', 'কাঁঠাল খাবো', 'বাঘ ও গরু' সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় শিশু ও বড়দের জন্য অনেক লেখালেখি করেছেন। বড়দের জন্য তাঁর রচিত কবিতার বই Silhonette and starlight Ges The Rest of the time দেশে বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। তাঁর Silhonette and Starlight কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েকটি কবিতা ভারতের জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের লিংগুইস্টিক বিভাগের দু'জন শিক্ষকের সম্পাদিত

Affiliated Eastwest press Pvt.Ltd. New Delhi থেকে প্রকাশিত South Asian Love Poetry নামক সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকান বয়োগ্রাফিকাল ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত The International Directory of Distinguished Leadership 1997 নামক গ্রন্থে ড. হালিমা খাতুনের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বাংলা কবিতার বই 'দুভাঁবনার সিঁড়ি' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

ড. হালিমা খাতুন শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে পৃথিবীর নানাদেশের শিক্ষাবিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি এদেশের শিক্ষাক্রম প্রাথমিক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বহু সেমিনার, কর্মশালায় এদেশের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য পরিচালনা করেছেন। বেশ কয়েকবছর বাংলাদেশ টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিচারকের ভূমিকা পালন করেন তিনি। বাংলাদেশ বেতারের শিক্ষার্থীদের আসরও তিনি দীর্ঘদিন পরিচালনা করেন।

ড. হালিমা খাতুন আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন। বিশিষ্ট আবৃত্তিকার প্রজ্ঞালাবনী ড. হালিমা খাতুনের একমাত্র সন্তান।

সেলিনা হায়াৎ আইভীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী ১৯৬৬ সালের ৬ জুন নারায়ায়নগঞ্জের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মা মমতাজ বেগম ও বাবা সাবেক পৌর চেয়ারম্যান আলী আহাম্মদ চুনকা। চুনকা পরিবারের পাঁচ সন্তানের মধ্যে ডা. আইভী প্রথম সন্তান।

দেওভোগ আখড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাজীবন শুরু করে নারায়নগঞ্জের প্রিপারেটরী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে মর্গ্যান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৭৯ সালে ট্যালেন্টপুলে জুনিয়র স্কলারশিপ পান এবং ১৯৮২ সালে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় স্টারমার্কসহ উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৮৫ সালে রাশিয়ান সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষাগ্রহণের জন্য ওডেসা পিরাগোব মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং ১৯৯২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে Doctor of Medicine (MD) ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৯২-৯৩ সালে ঢাকা মিডফোর্ট হাসপাতালে ইন্টার্নি সম্পন্ন করেন। ডা. আইভী তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষাজীবনের পর ১৯৯৩-৯৪ সালে মিডফোর্ট হাসপাতালে এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে নারায়ণগঞ্জ ২০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে অনারারি চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন।

১৯৯৫ সালের ১৫ নভেম্বর রাজবাড়ি নিবাসী কাজী আহসান হায়াৎ এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামী কাজী আহসান হায়াৎ বর্তমানে কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে নিউজিল্যান্ডে কর্মরত আছেন। পারিবারিক জীবনে তিনি দুই পুত্র সন্তানের জননী। ১৯৯৫ সালে তিনি নিউজিল্যান্ডে বসবাস শুরু করেন। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি দেশে ফিরে আসেন। গরীব ও দু:খী মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করে আসছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। তাঁর সকল কর্মকান্ডে পিতা

আলী আহাম্মদ চুনকার দানশীলতা, মানবপ্রেম ও একই সঙ্গে মানব সেবার প্রতিফলন ঘটে।

ডা. আইভী তাঁর শিক্ষাগত ও পেশাগত জীবনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরিভ্রমণ করেছেন। যেমন- জার্মান, হল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইতালি, শ্রীলংকা, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল ও ভারত।

স্কুল ও কলেজ জীবন থেকেই তিনি বাবার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৯৩ সালে তিনি নারায়নগঞ্জ শহর আওয়ামীলীগের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদিকা ছিলেন। ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত পৌর চেয়ারম্যান নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তিনি ১৬ জানুয়ারি ২০০৩ সালে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা চেয়ারম্যান নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার প্রথম মহিলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ২৭ জুন ২০১১ পর্যন্ত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০১১'তে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

বর্তমানে তিনি নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। আলী আহাম্মদ চুনকা ফাউন্ডেশন এবং নারায়ণগঞ্জ হার্ট ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) এর নারায়ণগঞ্জ জেলার আহ্বায়কের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এবং নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

সূচিপত্র:

কাজী ফাতেমা বর্নালী ও আব্দুস সবুর	১৩	সাহসী আসমা
শারমিন আক্তার	১৯	কাজল রানীর এগিয়ে চলা
জিল্লুর রহমান	২৪	জোসনা খাতুন -কোনো বেড়াজালই যাকে আটকে রাখতে পারেনি
এম.এ.হান্নান	২৯	তফুরার গল্প
খোরশেদ আলম	৩৪	দীপশিখা ছড়াচ্ছে দীপা
মোঃ গিয়াসউদ্দীন	৪৩	সফলতার সিঁড়িতে নাজমুন্নাহার
মো: আসলাম খান	৪৯	নিবেদিত নার্গিস
মোঃ শামসুদ্দীন	৫৫	নার্গিসের পথচলা
এ এস এম আখতারুল ইসলাম	৫৮	একজন নিরুপমা
শারমিন আক্তার	৬০	বৃষ্টি কাহিনী
মোঃ শামসুদ্দীন	৬৪	ধারাবারিষার ভারতী
মো: মাহমুদ হাসান রাসেল	৬৯	মমেনা বেগম ও তার কিছু উদ্যোগ
কাজী ফাতেমা বর্নালী	৭৪	বৃদ্ধাশ্রম ও মিষ্টির গল্প
নিয়াজ মোর্শেদ	৮০	শাহনাজ পারভীন : একজন সফল উদ্যোক্তা
মো: আসলাম খান	৮৫	সালেহার সংগ্রাম ও সাফল্য

সাহসী আসমা

কাজী ফাতেমা বর্নালী ও আব্দুস সবুর

সেদিন ছিল তার কলেজ জীবনের প্রথম দিন। সময়টা ছিল ১৯৭৮সালের ১জুন। প্রথম ক্লাসটি শেষ করে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় শিক্ষক এসে তার পেছনে সারিবেধে হাটতে বললেন। সহপাঠিকে প্রশ্ন করতেই সে উত্তর দিলো, 'ক্লাস না থাকলে শ্রেণীকক্ষের বাইরে মেয়েদের থাকা চলবে না, তাদেরকে কমনরুমে থাকতে হবে, ক্লাসে যাবার আগে শিক্ষক মেয়েদের ডেকে নেবেন, ক্লাস শেষে তারা শিক্ষকের পিছু পিছু কমনরুমে ফিরে আসবে, এমনটাই নিয়ম এই কলেজের।' এমন নিয়মের সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না তার। কারণ মাধ্যমিক পর্যন্ত বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন তিনি। এছাড়া, ছয় ভাই-বোনসহ চাচা-চাচী, চাচাতো ভাই-বোনদের নিয়ে যৌথ পরিবারেও মেয়েদেরকে ছেলেদের থেকে আলাদা করে রাখার বিষয়টি আসেনি। বিপত্তিটা বাঁধল কলেজ নিয়ে। মেয়েরা কি তার ক্লাসের ছেলে সহপাঠীদের কাছে নিরাপদ নয়? এমন প্রশ্ন মনে আসার সাথে সাথে শিক্ষকের দিকে ছুড়ে দিলেন তিনি। এই ঘটনার পরে শিক্ষকরা তাকে সাবধান করে দেন ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু তিনি ভয় না পেয়ে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই এই দেয়াল ভাঙার লড়াই শুরু করেন। সেই সাহসী মেয়েটির নাম আসমা আনসারী।

এরপর আসমা ক্লাসের সব মেয়েদের নিয়ে কমনরুমে বসেই কমনরুমের মধ্যে বন্দী না হয়ে থাকার জন্য পরামর্শ দিলেন। বেশ কাজে দিল পরামর্শটি। এর কিছুদিন পর শিক্ষক ক্লাসে যাওয়ার আগে লক্ষ্য করে দেখলেন যে কমনরুমে একজন মেয়েও নেই। শিক্ষকের বুঝতে বাকি রইল না যে এটা আসমার কাজ। সব মেয়েদের আসমা এভাবে বুঝিয়েছিল যে কমনরুমে থাকাটা হবে ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয়। এরপর আসমা আবৃত্তি, নাটক, খেলাধুলাতে অংশগ্রহণের

পাশাপাশি অন্য সহপাঠী মেয়েদেরও যুক্ত করলেন। ধীরে ধীরে এই সকল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শিক্ষকদের সঙ্গে হৃদ্যতা বাড়তে লাগল। আসমার এমন মুক্ত বুদ্ধির চর্চার শিক্ষা এবং এই কাজের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন তার মুক্তিযোদ্ধা ও প্রকৌশলী বাবা মো: আশরাফ হোসেনের কাছ থেকে।

১৯৮১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর একই কলেজে স্নাতকে ভর্তি হন আসমা। সেসময় বাড়িতে নিয়মিত 'বেগম' নামের সাহিত্য পত্রিকা আসত। লেখালিখির অভ্যাসটি আগে থেকেই ছিল কিন্তু এসময়ে এসে বেড়ে গেল। তরুন আসমার লেখায় সবসময় নারী, নারীর জীবন, স্বপ্ন, এসবই উঠে আসত।

১৯৮৩ সালে স্নাতক পাশ করার পর, আসমার ইচ্ছা ছিল বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করার। কিন্তু সেসময়কার কুষ্টিয়ার সাংসদ আক্কাস আলী পারিবারিকভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি উৎসাহ দিলেন 'ল' পড়ার জন্য। তার পরামর্শে ভর্তি হলেন কুষ্টিয়া 'ল' কলেজে। এর এক বছরের মাথায় বিয়ের প্রস্তাব এলো। ছেলে প্রকৌশলী, পারিবারিক সূত্রে পূর্ব পরিচিত। বিয়েতে আসমার কোনো আপত্তি ছিল না। পরিবারকে বলেছিলেন,যার সঙ্গে তিনি সারা জীবন কাটাবেন তার সঙ্গে কথা বলতে চান। তাই দেখার প্রথম সময়ে আবু আবদুল্লাহ আনসারীকে আসমা প্রশ্ন করেছিলেন ''আপনি শিক্ষিত ছেলে, আশাকরি সততার সঙ্গে উত্তর দেবেন। আপনি আমাকে কী হিসেবে পেতে চান? স্ত্রী, না স্ত্রী রূপে বন্ধু? ছেলেটি অবাক হলো আসমার সাহস দেখে। উত্তরটা বন্ধু ছিল বলেই বিয়ে হয়েছিল তাদের।

১৯৮৭ সালে আসমার বাবার বাড়ি কুষ্টিয়া কালীশংকরপুর এলাকায় বিশিষ্ট সাংবাদিক কাওসার আলী শেখের উদ্যোগে প্রথম কুষ্টিয়াতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুল গড়ে উঠে। পত্রিকাতে একটু আধটু লেখালেখির সূত্র ধরে কাওসার আলীর সঙ্গে আসমার পরিচয় ছিল। কাওসার আলী আসমাকে

স্কুলে যুক্ত হবার জন্য বললেন, আসমার প্রচন্ড আগ্রহ,স্বামীর কোনো আপত্তি ছিল না। আপত্তি ছিল না পরিবারের পরিচিত জনদেরও। তাদের কথা শিক্ষকতা যদি করতে হয় তাহলে প্রতিবন্ধী স্কুলে কেন? সেটি যেকোন স্কুলে হতে পারে। অনেকের মতকে উপেক্ষা করে আসমা যুক্ত হলেন স্কুলে। এ এক নতুন জগৎ, এই জগতের সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের কোনো কিছুই মেলানো যায় না। এভাবেই সমাজ সংসারে সবথেকে আবহেলিত শিশুদের সঙ্গে কাটতে লাগল তার সময়। ১৯৯২ সালে আসমার কোলজুড়ে একটি কন্যাসন্তান আসে। সন্তানের মা হওয়াতে নিজের সন্তানের সাথে সাথে স্কুলের প্রতিবন্ধী সন্তানদের প্রতি তিনি আলাদা অনুভূতি অনুভব করতেন।

২০০০ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ স্ট্রোক করে স্বামী আবদুল্লাহ আনসারী মারা যায়। আসমার জীবনে সাজানো সবকিছুতে একটা দমকা হওয়ার ঝটকা লাগে। এলোমেলো হয়ে যায় শ্বশুর বাড়ির পরিবারের সাথে সম্পর্ক। অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। দেবররা যে যার মতো প্রতিষ্ঠিত। তাদের কেউই এসে পাশে দাড়ালো না। বৃদ্ধ শ্বাশুড়ী একটি ননদ আর কন্যাকে নিয়ে শুরু করতে হলো আসমার নতুন জীবন। যেখানে তার ভরসা তিনি নিজেই। পরিচিত অনেকে তার বয়স উল্লেখ করে বলেছে নতুন করে সংসার করতে কিন্তু স্বামীর স্মৃতি, আর শিশু কন্যার মুখ চেয়ে আসমা তা পারেননি।

২০০৩ সালে আসমা স্কুলের এক শিক্ষক প্রশিক্ষণে ঢাকায় যান সেখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন সহকর্মী 'নিশাত' আসমাকে কথা প্রসংঙ্গে দি হাঙ্গার প্রজেক্টে-বাংলাদেশের কথা বলে। নিশাত নিজেও একজন উজ্জীবক। এছাড়া মেয়ের স্কুলের শিক্ষক জাফর আহমদের কাছেও সে হাঙ্গার প্রজেক্টে যুক্ত হবার আমন্ত্রণ পান। তারপর কুষ্টিয়া সদরে শুধু নারীদের নিয়ে ১২শ'১২তম একটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণে আসমা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আসমা নিজের কাজে নিজের প্রতিশ্রুতিটাকে যেন শাণিত

করার সুযোগ পেলেন। প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব, তার নিজের দায়িত্ব নেওয়া। যে নিজের দায়িত্ব নিতে পারে সে অন্যেরও কাছে দায়িত্ব নিতে পারার উদাহরণ হয়ে ওঠে। এই প্রশিক্ষণ তাকে নিজের সঙ্গে নিজের জন্য সংগ্রাম করা অনেকগুলো চেনা-অচেনা মানুষের সাথে পরিচিত করায়। সেখান থেকে তিনি এই শিক্ষা নেন যে, সমাজের সবথেকে অবহেলিত প্রতিবন্ধী শিশুদের শেখানের যে দায়িত্ব তিনি এতদিন চাকরি হিসেবে মনে করেছেন। আজ তা আর চাকরি নয় সত্যিকারের দায়িত্বে পরিণত হলো।

এই কাজের ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালের ৩-৫ আগস্ট কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুরের ৫০ জন অগ্রসরমান নারীকে নিয়ে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্স' অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও আসমা যুক্ত হন। সমাজের একজন নারী হিসেবে নিজের অবস্থান, সংকট, করনীয় ও সম্ভবনার বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

২০০৩ সালে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুদের উন্নয়ন ও অধিকার ভিত্তিক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন আসমা

সভাপতি হিসেবে যেখানে শহরের অনেক সচেতন, এগিয়ে আসা নারী-পুরুষ যুক্ত হয়েছেন। এই সংগঠনের কার্যক্রম হয়েছে গতিশীল। সংগঠনের সদস্যদের মাধ্যমে চলে এটি।

আসমা প্রতিবন্ধী স্কুলে কাজ করতে করতে উপলব্ধি করেন যে, এদের সাহায্য করার জন্য কেন মানুষের দারস্থ হতে হয়। তিনি ভাবলেন, যদি সমাজের অবস্থাসম্পন্ন ও স্বচ্ছল মানুষগুলো একজন সন্তানেরও দায়িত্ব নেয় তাহলে এই শিশুদের ভবিষ্যতে ভালো ভাবে বাচাঁর সম্ভাবনা থাকে।

এই চেতনায় তিনি একটি সাত বছরের প্রতিবন্ধী মেয়েকে তার বাড়ীতে রেখে লালন পালন করতে শুরু করেন। মেয়েটির নাম রেখা। বর্তমানে মেয়েটির বয়স বারো বছর। শিশুটির অনুভূতি খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেন। আসমার এই কৌতূহল স্কুলের শিশুদের পরিচর্যা সহায়ক হয়ে ওঠে। রেখাকে

খেলাধূলা ও নৃত্য শেখান আসমা । ২০১১ সালে রেখা জাতীয় পর্যায়ে নৃত্য পরিবেশন করে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

কলেজের কমনরুম থেকে প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসা সেই মেয়েটি এখন সবার কাছে অনুকরণীয়। দিনের বেশির ভাগ সময় তার কাটে বাইরে সামাজিক কাজে, মানুষের সাথে। একাধারে কুষ্টিয়া লালন একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমীর সদস্য। কমিউনিটি লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট এর নারী ফোরামের প্রচার সম্পাদক, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)-এর সদস্য। কুষ্টিয়া লেখিকা সংঘের অর্থ সম্পাদক। এছাড়া, জাতীয় সাহিত্য পরিষদেও প্রচার সম্পাদক হিসেবে রেখে চলেছেন দায়িত্বের ছাপ। অবসরে নিজে অব্যক্ত কথাগুলো লিখে ফেলেন। এরইমধ্যে মানুষকে ভালোবেসে লেখা 'হৃদয়ের প্রতিবেশী' 'রিমঝিম, 'তিনকন্যা' কাব্যগ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

সেই কমনরুম থেকে যে যাত্রার শুরু তিনি করেছিলেন তার শেষটাও দেখে যেতে চান। দেখে যেতে চান সারাদেশের নারীরা সব ধরণের নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে। সমতার সমাজ তৈরি লড়াইয়ে আসমা এগিয়ে যাক, জয় হোক আসমার, জয় হোক তার সাহসের।

কাজল রানীর এগিয়ে চলা

শারমিন আক্তার

প্রত্যেকের জীবনেই দু:খ-কষ্ট, ক্লান্তি-শ্রান্তি কমবেশি আসে। কিন্তু সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যিনি গড়ে তুলতে পারেন নিজের বলিষ্ঠ অবস্থান সেই সফল মানুষ। জীবনের বিপর্যস্ত মুহূর্ত থেকে উঠে আসা এমনই একজন আত্মপ্রত্যয়ী নারী কাজল রানী রায়।

খুলনা জেলার আইচগাতী গ্রামে কাজল রানী রায়ের জন্ম ১৯৬৪ সালে। মা স্বারতী রায় একজন গৃহিণী। বাবা নির্মল চন্দ্র রায় খুলনা টেক্সটাইল মিলের ওয়ার্কশপ বিভাগের ওয়েল্ডার প্রধান ছিলেন। কাজলের শৈশব কেটেছে খুলনার ইকবাল নগরে। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছেন ইকবাল নগর স্কুল থেকে। মা-বাবার অনুপ্রেরণা সবসময়ই কাজলের চলার পথের শক্তি হিসেবে কাজ করতো। ছোটবেলা থেকেই স্বাবলম্বি হওয়ার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। কাজল যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তেন তখন থেকেই আয়মুখী কার্যক্রমের সঙ্গে জরিত ছিলেন। স্কুলে পড়াশুনার সময় থেকেই তিনি খুলনার খ্রিস্টান মিশনে সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে সেখানেই কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও স্কুলে ভালো ফলাফলের জন্য বৃত্তি পেতেন কাজল। তাই নিজের পড়াশুনার খরচ নিয়ে মা-বাবাকে ভাবতে হয়নি। ১৯৮০ সালে খুলনা সহরাওয়ার্দী বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন কাজল।

এরপর খুলনা সুন্দরবন কলেজে পড়ার সময় ১৯৮১ সালে পরিবারের অমতে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেন গুরুপদ দাশকে। তিনি পেশায় একজন দর্জি ছিলেন পাশাপাশি পরিবারের আয় বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে জরিত ছিলেন। কাজলের শ্বশুর-শ্বাশুরি কেউ জীবিত ছিলেন না। স্বামী গুরুপদের ভাই-বোনদের নিয়ে ছোট সংসার ছিলো কাজলের। বিয়ের পর ১৯৮২ সালে প্রথম পুত্র সন্তান ও ১৯৮৩ সালে দ্বিতীয় পুত্র-সন্তানের জন্ম দেন কাজল রানী রায়। স্বামীর অনুপ্রেরণা সবসময়ই ছায়ার মতো পাশে ছিলো কাজলের চলার পথে। এরমধ্যে ১৯৮৮ সালে সহকারি শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন

'সোনামনির আসর কিন্ডারগার্টেন' স্কুলে। বিয়ের পর পড়াশুনায় বিরতি নেওয়ায় তিনি ১৯৯০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর ডিগ্রি পড়া স্থগিত রেখে খুলনা হোমিওপ্যাথি কলেজ থেকে তিনি ১৯৯১ সালে ডি.এইচ.এম.এস ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯৯৫ সালে বি.এল কলেজ থেকে প্রাইভেটে ডিগ্রি পাশ করেন। ছোট বেলা থেকেই পড়াশুনার

পাশাপাশি বিভিন্ন সঙ্গে জরিত ছিলেন কাজল। বর্তমানেও তিনি এসকল কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

বিয়ের পর বেশ সুখেই কাটছিলো কাজলের জীবন। সব মিলিয়ে ভালই চলছিল দিনগুলো। কিন্তু চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন হঠাৎ তার স্বামী স্ট্রোক করায়। অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার খরচ বহন করতে যেয়ে পড়ে যান চরম আর্থিক সংকটের মুখে। কিন্তু খরচ বহনের দায় বেশি দিন নিতে হয়নি কাজলের। ২০০৭ সালের নভেম্বরে মারা যান কাজলের স্বামী। স্বামীর মৃত্যুর পর এমন কিছু কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হতে হয় কাজলকে যা কখনো

কল্পনাও করেননি। অর্থসঙ্কট থাকার কারনে টাকা ধার করে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন শ্রাদ্ধের আচার-অনুষ্ঠান। এদিকে একার পক্ষে সংসারের খরচ বহন করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে কাজলের। এসময় তিনি তার স্বামীর সম্পত্তির অংশ হিসেবে প্রায় সাত বিঘা জমি লাভ করেন। এবং আয় বাড়ানোর জন্য তার কিছু অংশ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাঁধ সাধে তার দেবর-ননদ। তাদের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিরোধে জড়িয়ে পড়েন কাজল। স্বামীকে হারানোর শোক আর নিজের অধিকারের লড়াই কখনো আশাহত করে দেয়নি কাজলকে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের হস্তক্ষেপে অবশেষে কাজল তার প্রাপ্য জমির ভাগ ফিরে পান। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জমির কিছু অংশ এবং স্বামীর ব্যবসার কিছু জমানো টাকা ও নিজের গহণা বিক্রি করে বড় ছেলেকে দুবাই পাঠিয়ে দেন। কিন্তু, কিছুদিন যেতে না যেতেই ছেলেও দেশে ফিরে এল। এরপর কিছুটা আশাহত হলেও নিজ শক্তিতে হাল ধরেন কাজল রানী। নিজের স্কুলের চাকরি, দুই ছেলের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ছোট ছেলের ব্যবসার টাকায় স্বচ্ছলভাবে চলতে থাকে কাজলের সংসার।

বেঁচে থাকার সংগ্রামে মাথা নত করেননি কাজল। কিন্তু এখানেই থেমে যায়নি কাজলের সংগ্রামের গল্প। ২০০৮ সাল। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ থেকে ১৪শ'৪২ তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ ও নারী নেতৃত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণে অংশ নেন তিনি। উজ্জীবিত হলেন জীবনে আবার গতিময়তা ফিরিয়ে আনতে। সেই সূত্র ধরেই স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গড়ে তুললেন ৩০জন সদস্য নিয়ে মাসিক ৩০ টাকা সঞ্চয়ের ভিত্তিতে একটি নারী সংগঠন। সংগঠনটির নাম 'সুরভী মহিলা যুব সংগঠন'। বর্তমানে তিনি এ সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত।

তার নেতৃত্বে আটটি বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে অত্র এলাকায়। যৌতুক বিহীন বিয়ের জন্যও কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠায় ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভুক্ত 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি', 'ভিজিপি' ও 'ভিজিডি' কার্ড বিতরণ, বিধবা ও বয়স্ক ভাতার কার্ড প্রদান

প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক সময়ে অবগত হন এবং এলাকার দরিদ্রদের মধ্যে যেন তা সঠিকভাবে বিতরণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। এলাকার মানুষ যেকোনো সমস্যায় সুপরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য ছুটে আসেন কাজল কাছে। ইতিমধ্যে তিনি এলাকার মানুষদের সংগঠিত করে ৫ জন হতদরিদ্র মানুষের চিকিৎসা এবং অতি দরিদ্র পরিবারের চারটি মেয়ের বিয়ে সম্পাদনে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এলাকার গর্ভবতী নারীদের নিয়মিত স্থানীয় নারীমঙ্গল কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া, গাইনী ডাক্তার দেখানো, সঠিক সময়ে টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় সকল শিশুকে সঠিক সময়ে টিকা প্রদান ও ভিটামিন খাওয়ানোর জন্য তিনি এলাকার জনগণকে সচেতন করেন।

একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসেবে তিনি এলাকার দরিদ্র মানুষদের ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করেন। এছাড়া বিভিন্ন ভাইরাসের প্রতিশেধক বিনামূল্যে প্রদান করেন। গত চারবছর ধরে তিনি এ চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন।

একজন শিক্ষিকা হিসেবে তিনি প্রতিবছর প্রায় ২০ থেকে ৩০ জন দরিদ্র শিক্ষার্থীকে ফ্রি কোচিং প্রদান করেন এবং ৫ থেকে ৬ জন ছাত্রীর স্কুলে ফ্রি ভর্তির ব্যবস্থা করেন। নারীদের বিভিন্ন সমস্যায় তিনি আইনী পরামর্শও প্রদান করেন।

দুঃস্থ নারীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি ও তার নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠন 'সুরভী'। এই সংগঠনের সদস্যগণ নিজেদেরকে সাবলম্বী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। তারা মুদি দোকান, কাঠের ব্যবসা, নার্সারী ও মৎস্য চাষের মতো বিভিন্ন আয়মূলক কাজ হাতে নিয়েছেন। এসব কাজের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের আর্থিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

জীবনের চরম দুঃসময়কে জয় করে সফল হয়েছেন কাজল রানী রায়। দুই

ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। দুজনই এখন সফল ব্যবসায়ী। কাজল নিজের উন্নতির সঙ্গে এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সম্ভাবনার পথে, সফলতার দ্বারপ্রান্তে। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন এলাকার প্রতিটি মানুষের কাছে প্রিয় একজন মানুষ। হয়ে উঠেছেন সকলের প্রিয় কাজল দিদি।

কাজল চান আজীবন এভাবেই মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যেতে, চান মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান করে নিতে, চান হতদরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্থ মানুষের পাশে থেকে তাদের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ তথা জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে। আর আশা করেন দারিদ্রমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। তিনি নিজে যেমন একজন আলোকিত মানুষ হয়েছেন, তেমনি প্রভাত রবির মতো কিরণ ছড়িয়ে যাচ্ছেন খুলনা জেলার আইচগাতী গ্রামের প্রতিটি মানুষের মধ্যে। তার এই নিরন্তর প্রয়াসের মধ্য দিয়েই তিনি স্বপ্ন দেখেন স্বচ্ছল বাংলাদেশের।

জোসনা খাতুন- কোনো বেড়াজালই যাকে আটকে রাখতে পারেনি

জিল্লুর রহমান

১৯৭১ সালে নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারের কল্যান্দীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেন বেগম জোসনা খাতুন। বাবা-মা মোঃ ইদ্রিস আলী ও মহিতুননেচ্ছার আট সন্তানের মধ্যে ষষ্ঠ সন্তান জোসনা। ষষ্ঠ সন্তান হওয়া সত্বেও তাদের কাছে জোসনা অন্যদের থেকে একটু বেশিই আদরের। তার চাওয়া পাওয়া অন্যদের থেকে যেন একটু আলাদা ধরনের। এই ভিন্নতাই যেন তাকে বাবা মায়ের কাছে বেশি আদরের করে তোলে।

পরিবার বড় হওয়া সত্বেও ইদ্রিস আলী ও মহিতুনেচ্ছা সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত যত্নশীল। জোসনা লেখাপড়ার ব্যাপারেও তার অন্য ভাই বোনদের থেকে বেশি আগ্রহী ছিলেন। ক্লাসে বরাবর প্রথম হওয়া ছাত্রী জোসনার লেখা পড়া সহ অন্যান্য কাজকর্ম ভালই চলছিল। তিনি যখন চতুর্থ শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন, একদিন জোসনার স্কুলের কল্যান্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব ওয়াহিদুজ্জামান তাদের বাড়ীতে এসে তার বাবাকে বলেন মেয়ের বৃত্তি পরীক্ষার জন্য উৎসাহিত করেন। মা-বাবাও জোসনার ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হন। বাঁধ সাধে পাশের বাড়ীর সহিদুল্লাহ। এরই মধ্যে জোসনার মাতৃ বিয়োগ যেন বিনা মেঘে বজ্রঘাত। একই গ্রামের এক ধনাঢ্য পরিবারের আদরের বাউন্ডেলে সন্তান সহিদুল্লাহ। নিত্যকার কাজ, ঘুম থেকে ওঠে রাস্তার মোড়ে বখাটেপনা করা। তার বখাটেপনা যেয়ে অবশেষে পড়ে মেধাবী ছাত্রী জোসনার ওপর। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া ও আসার সময় সহিদুল্লাহ জোসনাকে নানা ভাবে বিরক্ত করা শুরু করে। দিন যত যায় বিরক্ত করার মাত্রা বাড়তে থাকে। ভিতরে ভিতরে জোসনা সংকুচিত হতে থাকে। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে সহিদুল্লাহ জোসনার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। জোসনা বিষয়টি পরিবারকে জানায়। জোসনার পরিবার সহিদুল্লাহ'র পরিবারের সাথে কথা বলে বিষয়টি

সমাধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনো লাভ হলো না, এমন কি জোসনার স্কুলের প্রধানশিক্ষকও সহিদুল্লাহ'র পরিবারের সাথে কথা বলেন। কিন্তু বিধি বাম, এখানেই জোসনার নিয়মিত স্কুল জীবনের ইতি ঘটল।

মাতৃহীন সন্তান জোসনাকে নিয়ে বাবা ইদ্রিস আলী পড়ে মহাসংকটে। উপায়ন্ত না দেখে সমাজের গৎবাঁধা নিয়মে বিয়ে ঠিক করে কিশোরী জোসনার। মা মহিতুনেচ্ছা বেঁচে থাকলে হয়তো এমনটা নাও ঘটত জোসনার জীবনে।

পাশের ছোট বাড়িপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মুক্তিযোদ্ধা এস এম ফজলুর রহমান এর সঙ্গে ঘটা করে বিয়ে হয় জোসনার। শুরু হয় অন্য আরেক জীবন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম অনুসারে শ্বশুর আলয়ের সব দায়দায়িত্ব যেয়ে পড়ে জোসনার ওপর। পুতুল খেলার বয়সেই জোসনাকে পালন করতে হয় একানুবর্তী সংসারের দায়িত্ব। জোসনার স্বামী পেশায় স্কুল শিক্ষক এবং মানসিকতায় আধুনিক। তিনি জোসনার অব্যক্ত মনের কষ্টগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতেন। এটাই ছিল জোসনার ভগ্নহৃদয়ের একমাত্র সান্ত্বনা। তিনি সর্বদা জোসনার

সৃষ্টিশীল মনকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। একান্নবর্তী পরিবারের দায়দায়িত্ব পালন করতে করতে একটুও ফুসরত পেত না। এর মধ্যেই জোসনা, তার নিজের ভিতর আর একটা অস্তিত্ব অনুভব করতে শুরু করে। সময় যেতে না যেতেই জোসনার কোল জুড়ে আসে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান। দায়দায়িত্ব জোসনার ঘাড়ে বেড়েই চলল। স্বামী সংসার সন্তানসহ একান্নবর্তী পরিবার দায়িত্ব পালন করতে করতে হাঁপিয়ে উঠছিলেন। হঠাৎ করে মাত্র এগার মাস বয়সে পানিতে ডুবে মারা যায় তার প্রথম সন্তানটি। এবার একেবারে ভেঙ্গে পড়েন জোসনা। স্বামী বিষয়টি আচ করতে পেরে তাকে আবারও পড়াশুনার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। মেধাবী জোসনার পাঠক মন স্বামীর এই প্রস্তাবে যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল। এর এক বছর পর আবারও জোসনার কোল জুড়ে আসে আরেকটি পুত্র সন্তান। এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জোসনা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় দেয় এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু ভাগ্যদেবী যেন সব সময় তাকে পেছনের দিকে টেনে ধরতে চায়। এরই মধ্যে জোসনার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী মার যায়। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে তাদের একটি নতুন সংসার শুরু হয়। এখানেও নতুন বিপত্তি তৈরি হয়। স্বামীর জোগাড়ের টাকায় সংসারের ব্যয়ভার সংকুলান করা কঠিন হয়ে দাড়ায়।

সর্বাংসহা বেগম জোসনা খাতুন যখন দিশেহারা প্রায়, তার স্বপ্নের কুঁড়িগুলো যখন শুকাতে বসেছে এই রকম একসময়ে সে যায় আড়াইহাজার উপজেলা পরিষদের সমাজ সেবা অফিসে, কিছু লোন পাওয়ার আশায় এবং তা দিয়ে কিছু করা যায় কিনা, আলোচনা হয় উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তার সঙ্গে। ভদ্রলোক জোসনা খাতুনের আগ্রহ ও অস্থিরতা দেখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের একটি প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দেন। জোসনা কিছুটা বিরক্ত হয়েই ফিরে আসে সমাজ সেবা অফিস থেকে। সে যেন আরও একটু ভেঙ্গে পড়ল। এর বেশকিছু দিন পর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার উদ্যোগে আড়াইহাজার পাইলট হাইস্কুলে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের একটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণটির খবর সমাজ সেবা অফিসার জোসনা খাতুনকে পৌছে দেয় এবং প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ

করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোসনা প্রশিক্ষণটিতে অংশ নেয়। হাঙ্গার প্রজেক্টের ৬৬৯ তম প্রশিক্ষণটি যেন জোসনার অন্ধকার জীবনের আলোক বর্তিকা।

ফিরে যায় জোসনা, বাড়িতে স্বামী এস এম ফজলুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করেন, ফজলুর রহমান তাকে উৎসাহ যোগায়। কাজে নেমে পড়ে জোসনা, স্বামীর আয়ে পরিবারের ভরণপোষণ যথাযথভাবে সংকুলান না হওয়ায় বাড়তি আয়ের জন্য গরু ছাগল হাঁস মুরগীপালন, সবজী চাষ, জমি বর্গা উসলী নিয়ে আয়বর্ধক কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও জোসনা যেটি থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হয়নি, সেটি হচ্ছে তার লেখাপড়া। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর সে শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবে না, সমাজের অন্যদেরকেও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য নানা ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। সমাজের স্বল্প আয়ের নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন নারী কল্যাণ সমিতি। সমিতির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, সচেতন করার লক্ষ্যে উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা, র‍্যালিসহ নানা ধরণের কর্মকান্ড পরিচালনা করেন জোসনা খাতুন। এ সমিতির তহবিল হতে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে সমিতির অনেক সদস্যই এখন স্বাবলম্বী। জোসনা এখন তিন সন্তানের জননী, হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও সন্তানদের ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান তিনি। সন্তানদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তার তিন সন্তানের মধ্যে প্রথম সন্তান স্নাতক্তোর, দ্বিতীয় সন্তান মালয়েশিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এরোনোটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যয়নরত, একমাত্র মেয়ে বিবিএ শেষ করে এমবিএ করছে। জোসনা নিজের লেখাপড়ার ব্যাপারেও কম যাননি। ইতিমধ্যে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন।

পেছনে ফিরে তাকাতে চাননা জোসনা খাতুন, কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি ডুবে যান স্মৃতি রোমান্থনে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে চঞ্চলা ছোট্ট জোসনা, তখন তার হৃদয় মোচড় দিয়ে ওঠে। আর কোনো কন্যাশিশুর অবস্থা যেন তার মত না হয়, সে জন্য তিনি কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষার জন্য গড়ে তুলেছেন আড়াই হাজার জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম, তিনি নিজেও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য।

এরই মধ্যে জোসনা খাতুন হাঙ্গার প্রজেক্টের নারী নেতৃত্ব বিষয়ক ফাউন্ডেশন ট্রেনিং টি তিনি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেন।

মনের ঈশাণ কোনে জমে থাকা যন্ত্রনাগুলো মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। আর যাই হোক দুঃসহ সেই অতীতকে এখন আর ভাবতে চান না তিনি। এখন শুধু সামনে এগিয়ে চলা। এলাকার মানুষগুলোকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য তার প্রচেষ্টা এখন অনেকের প্রেরণার উৎস। মানুষ হিসেবে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার সংগ্রাম যেদিন শুরু হয়েছিল তার বহমানতা আজ অবধি চলমান। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে সমতার পৃথিবী বিণির্মানের সাহসী সংগ্রামে লিপ্ত শত শত নারীর মিছিলে এক লড়াকু যোদ্ধা বেগম জোসনা খাতুন। ইতিমধ্যে জোসনা খাতুন আড়াইহাজার ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সদস্য নির্বাচিত হন। বিভিন্ন ধরণের সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করেছেন নিজেকে। তিনি এখন উপজেলা সমাজ কল্যাণ সংস্থার সদস্য, উপজেলা সামাজিক উন্নয়ন কমিটির সভানেত্রী, আড়াইহাজার উপজেলা আওয়ামীলীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সহ প্রায় ১৫টি প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অবদান রেখে চলেছেন।

সমাজের নানা অসঙ্গতিগুলোকে সমাজের অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করার জন্য জোসনা খাতুন, হাতে তুলে নেন কলম। শুরু করেন লেখালেখি। স্বনামধন্য জাতীয় দৈনিক ভোরের কাগজে কাজ করার মধ্য দিয়ে তার সাংবাদিক জীবন শুরু হয়। জোসনা খাতুন যেন কবির ভাষার প্রতিচ্ছবি 'প্রবল অটল বিশ্বাস যার, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, কোন বাঁধা তার রোধে নাকো পথ কেবলই সম্মুখে চলে। সমাজের যেখানে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা সেখানেই হাজির জোসনা খাতুন। পাল্টাতে চায় সমাজটাকে, ভেঙ্গে ফেলতে চায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এই বৈষম্যমূলক নিয়ম কানুন। জোসনা খাতুন যেন বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। আড়াইহাজারের সেই স্বপ্নচারী ছোট্ট মেয়ে জোসনা, শতবাধা পেরিয়ে আড়াইহাজার প্রেসক্লাবের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বেগম জোসনা খাতুন।

তফুরার গল্প

-এম.এ.হান্নান

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ভাটরা গ্রামে নবনির্বাচিত একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ডা. তফুরা আক্তার মজুমদার। এই পরিচয়টি তার বর্তমান অবস্থানকে সুস্পষ্টভাবে পাঠকদের কাছে তুলে ধরছে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই কারো দ্বিমত নেই। একই সঙ্গে এই সাফল্যের পেছনে যে অসংখ্য প্রচেষ্টাগুলো রয়েছে তা নিঃসন্দেহে সকলেরই জানার ইচ্ছা হচ্ছে। চলুন প্রিয় পাঠক তাহলে একজন আত্মপ্রত্যয়ী নারীর সাফল্যের গল্প শুনি।

শৈশবকাল থেকে বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বেড়ে ওঠেছেন তফুরা আক্তার। সংসারে নানা অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে তাকে। বাবা আইয়ুব আলী মজুমদার ছিলেন একজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক এবং মা মাছুমা বেগম ছিলেন গৃহিণী। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে তফুরা সর্বকনিষ্ঠ। এমনিতেই সংসারে অভাব এরপর আবার সমাজের তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান-ধারনা বাঁধ সাধে তফুরার চলার পথে। তার বিকশিত হবার গতিকে বাধা দিতে মরিয়া হয়ে ওঠে পরিবার ও সমাজের মানুষ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করা সত্যিই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় তফুরার ভবিষ্যৎ এর জন্য। মেঘের আড়ালে সূর্যের মতো তার জীবনে আলো-অন্ধকারের লুকোচুরি খেলা শুরু হতে থাকে।

এই লুকোচুরি খেলা প্রথমে শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর তফুরার পরিবার পড়াশুনার প্রতি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করত না। স্বপ্ন দেখতেন একদিন তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করবেন এবং প্রতিষ্ঠিত নারী হিসেবেই সমাজে আত্মপ্রকাশ করবেন। মানুষের মনের প্রবল ইচ্ছা আর সততায় থাকলে হয়তো পূরণ হওয়ার পথ সে খুজে পায়। ঠিক তিমনটিই ঘটেছিল তফুরার ক্ষেত্রে। মেজো ভাই দেলোয়ার হোসেন এর সহযোগিতায়

এবং নিজের প্রবল আগ্রহে তফুরা টিউশনি করে পড়াশুনার খরচ বহন করতে শুরু করে। মাধ্যমিক পাশ করাই ছিল তার আরাধনা। কিন্তু এতো সাধনা আর কঠোর পরিশ্রম করার পরও ভাগ্য তার সঙ্গে পরিহাস করতে শুরু করে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম পূরণের সময় ঘনিয়ে আসলে তফুরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ, টিউশনি করে যে সামান্য টাকা পেত, তা দিয়ে টেনে-টুনে নিজের পড়াশুনার খরচ মেটাতে গিয়ে বাড়তি টাকা সঞ্চয় করতে পারেনি তফুরা। এদিকে, তফুরার পরিবারেরও ফর্ম পূরণের টাকা দেওয়ার সামর্থ ছিল না। অবশেষে উপায় একটা হলো। ভাগ্য শেষ পর্যন্ত পরিহাস করতে পারেনি। তফুরার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহ দেখে শিক্ষকদের মনে সহানুভূতি হয়। স্কুলের শিক্ষকরা টাকা যোগাড় করে ফর্ম পূরণের ব্যবস্থা করেন।

১৯৯৩ সাল। তফুরা সাফল্যের সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এভাবে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার নির্মম অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে সঞ্চয় হতে থাকে। শুরু হয় পরবর্তী ধাপের প্রচেষ্টা। চৌদ্দগ্রাম ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক এম.এ.মতিন এর সুপারিশে কলেজে ভর্তি হন তিনি। কিন্তু পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যার কারনে ১৯৯৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক

পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে ব্যর্থ হন তিনি। এরপর পরিবারের চাপে পড়াশুনা বন্ধ করে দেন। শুরু হয় এক দুঃসহ জীবন। স্বপ্নের সাথে বাস্তবের কোনো মিল খুজে না পেয়ে অনেকটা মুখ থুবরে পড়েন তফুরা। কিন্তু টিউশনি বন্ধ করেন না তিনি। এরই মধ্যে হঠাৎ করে তার মা-বাবা দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদেরকে পরিচর্যার পুরো দায়িত্ব শক্ত হাতে পালন করেন তফুরা। এভাবে প্রায় কয়েক বছর পার হয়ে যায় তফুরার।

১৯৯৯ সালের কথা। একদিন স্থানীয় একজন উজ্জীবকের মাধ্যমে জানতে পারলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ পরিচালিত উজ্জীবক প্রশিক্ষণের কথা। তিনি তেমন কিছু এই প্রশিক্ষণের সম্পর্কে না জেনেই আগ্রহী হলেন। এরপর ১শ'৬তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তফুরার মধ্যে তার হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস আবার পুনরুজ্জীবিত হন। তার হতাশাগুলো ধীরে ধীরে দুর হতে থাকে। তফুরা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন পুনরায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য। বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠনের সঙ্গে কাজ করে কিছু টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করেন। পাশাপাশি টিউশনিও অব্যাহত রাখেন। ১৯৯৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন তিনি। এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ডিগ্রিতে ভর্তি হন লাকসাম এর লালমাই কলেজে। নিজের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করেন তফুরা। তাই নিজের গলার একটি স্বর্ণের চেইন ও কানের দুল বিক্রী করে একটি গরু কিনে লালন-পালন শুরু করেন।

পড়াশুনা, টিউশনি আর পরিবারের কাজ সামলিয়ে তফুরা বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন। গ্রামের হতদরিদ্র মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ, নিরক্ষরতা, পরিবার-পরিকল্পনা, টিকাদান এর প্রচারাভিযান পরিচালনার কাজ করে থাকেন। তার ভাষায় সামাজিক দায়বদ্ধতাই এসকল কাজে তাকে উৎসাহিত করে।

দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর তফুরার বাবা মারা যান। তফুরা তখন ডিগ্রির দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছিলেন। বাবার মৃত্যুর আগে অসুস্থতার সময় ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত ইনজেকশন দেওয়ার জন্য গ্রামে কোন ডাক্তার ছিল না। বিষয়টি তফুরার মনকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে মেডিকেল লাইনে পড়াশুনা করার জন্য। চলে আসেন লালমাই কলেজ থেকে। এরপর কুমিল্লা শহরে চলে যান ২০০১ সালে। সেখানে তার খালার বাসায় থেকে টিউশনি শুরু করেন। টিউশনি করতে গিয়ে ডা: হালিদা হানম এর সাঙ্গে পরিচয় হয় তফুরার। হালিদা হানম কে নিজের ইচ্ছার কথা জানান তিনি। পুরো ঘটনা শুনে ডা: হালিদা হানম এর মনে ভীষণভাবে দোলা দেয়। এরপর হেলথ প্রমোশন লিমিটেড মেডিকেল সংস্থায় মেটারনিটি প্রাকটিশনার কোর্সে ভর্তি হতে পূর্ণ সহযোগিতা করেন ডা: হালিদা হানম আক্তার । গরু বিক্রী করা টাকা এবং টিউশনি করে জমানো টাকা দিয়ে দিয়ে তিনি ভর্তি হন।

২০০৩ সালে কোর্স করে ভালো ফলাফল করলে আবার গ্রামের চলে আসেন এবং ডা: হালিদা হানমের সহযোগিতায় ভাটরা ইউনিয়নে একটি পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। ডা: হালিদা হানম আক্তার প্রায় ১০ হাজার টাকা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি উদ্বোধনের সময় দান করেন।

এছাড়াও ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজনসহ ফ্রি ঔষধ, টিকা এবং পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সমাজ সেবার কাজে পুরোপুরি নিজেকে যুক্ত করেন তফুরা। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেচ্ছাসেবিকা হিসেবে নিয়োজিত থাকায় কিছু ফ্রি ঔষধ পান তিনি।

২০০৫ সালে তফুরার ভাইয়ের ইচ্ছায় সৈয়দ আনিসুর রহমনের সঙ্গে বিয়ে হয় তফুরার। আনিসুর রহমান পেশায় একজন প্যারামেডিক ডাক্তার। বিয়ের এক মাস পর আকস্মিকভাবেই এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার স্বীকার হন আনিসুর রহমান । ডান পায়ে প্রচন্ড আঘাতের কারণে অনেকটা পঙ্গুত্বই বরণ

করতে হয় তাকে। বিশকিছুদিন বাংলাদেশে থেকে চিকিৎসা করেও কোনো লাভ না হলে ২০০৯ সালে তিনি মাদ্রাজে চিকিৎসার জন্য চলে যান। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসারত রয়েছেন।

এতো বাধা বিপত্তির মধ্যেও থেমে থাকেনি তফুরার পথ চলা। কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্য তাকে পথ দেখিয়েছে সাফল্যের। ২০১১ সালের ১৫ জুন তফুরা মজুমদার ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যক্ষ ভোটে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচিত হন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ আয়োজিত ৭৩ তম ব্যাচের নারীনেত্রী। তফুরার স্বাকজার সাথে যে প্রেরণা যুক্ত হয়েছে, তা তাকে অধিষ্ঠিত করেছে এক ভিন্ন উচ্চতায়। সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে একজন সফল নারীনেত্রীর ভূমিকায়। যা ভাটরা গ্রামের পিছিয়ে পড়া এবং জীবন সংগ্রামে শান হয়ে যাওয়া নারীদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

দীপশিখা ছড়াচ্ছে দীপা

-খোরশেদ আলম

নিজের মায়ের কাছে যে একসময় ছিল অপ্রত্যাশিত সন্তান, সেই দীপা মজুমদার এখন শুধু নিজের সংসারের হালই ধরেননি, নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অনেক দরিদ্র নারীকে। নিজের সাফল্যের ইতিহাস বলার সময় শৈশবের তেমন কোনো আনন্দের স্মৃতি মনে পড়েনি দীপার। দীপা মজুমদারের সংগ্রামের সঙ্গে তার মা-বাবার বিয়ের ঘটনাটি অতোপ্রতোভাবে জড়িত। প্রিয় পাঠক, চলুন প্রথমে ঘটনাটি জেনে নেই।

দীপার বাবা যুগল কীশর মজুমদার ও মা আরতী রায়। যুগল কীশর মজুমদার ১৯৭৪ সালে উভয় পরিবারের সম্মতি ছাড়া জোরপূর্বক আরতী রায়কে বিয়ে করেন। এই বিয়েতে আরতী নিজেও রাজি ছিলেন না। যুগল কীশরের পরিবারের অসম্মতির কারণে বিয়ের পর আরতীর জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে। অবহেলা আর নানা নির্যাতনের শিকার হতে হয় তাকে। কিছুদিনের মধ্যেই আরতী বুঝতে পারেন যে তিনি মা হতে যাচ্ছেন। জন্ম নেয় দীপা। এরপর দীপার যখন সাত মাস বয়স তখন আরতী তার বাবার বাড়ি বেড়াতে গেলে তার পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ের সম্পর্কের ইতি টানার। কিন্তু দীপার জন্মের কারণে তা সম্ভব হয়নি।

দীপা মজুমদারের বর্তমান নিবাস যশোর জেলা শহরের রেল রোডে। জন্ম ১৯৭৫ সালে বাবার পৈত্রিক বাড়ি যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার বন্দভিলা ইউনিয়নে। চার বোনের মধ্যে দীপা মজুমদার সকলের বড়। বাবা পেশায় একজন পরিবহণ চালক। মা একজন গৃহিণী। ।

এখনও দীপার মায়ের বদ্ধমূল ধারণা, তার জীবনটা নষ্ট হয়েছে দীপার জন্মের

কারণে। সে সময় দীপা তার গর্ভে না আসলে তার জীবনটা অন্যরকম হতে পারতো। দীপার জন্মের কারণে তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি।

দীপার বয়স যখন এক বছর, তখন তার মা-বাবা চলে যান যশোর শহরে। এরপর বাবা ড্রাইভিং শিখে চাকরি নেন সোহাগ পরিবহনের বাসে। ধীরে ধীরে সংসারের অভাব দূর হতে থাকে। সংসারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেও তার প্রতি মায়ের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি। ছোট বোনদের ভালো স্কুলে ভর্তি করালেও দীপাকে ভর্তি করিয়েছেন রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ে। দীপা যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তেন, সকাল থেকে বাড়ির সব কাজ করেই কেবল স্কুলে যাওয়ার সুযোগ মিলতো তার। ৫ম শ্রেণীতে পড়ার সময় স্কুলের শিক্ষকগণ তাকে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করলেও বাঁধ সাধেন মা।

রামকৃষ্ণ আশ্রম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে ভর্তি হন

মধুসূধন তারাপ্রসন্ন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এভাবে চলতে থাকে বেশ কয়েক বছর। ১৯৯০ সালে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় বাবার ইচ্ছায় দিলীপ মন্ডলের সঙ্গে বিয়ে হয় দীপার। দিলীপের মা মারা যাওয়ার পর তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে ভারতে চলে যান। দিলীপ মন্ডল থেকে যান যশোরের কালীগঞ্জের বারোবাজারে তার মামা বাড়িতে। মামাবাড়িতে থেকে তিনি ব্যবসা করতেন। বিয়ের পর দিলীপের বাবা তাদের দু'জনকে ভারতে নিয়ে যান। ভারতে বাগদায় যাওয়ার পর দীপার জীবনে নেমে আসে অমানিশার অন্ধকার। দীপার স্বামী ভারতে গিয়ে ভালো কোনো কাজ যোগাড় করতে না পাড়ায় দীপার ওপর অমানুষিক নির্যাতন করেন তার শ্বাশুড়ী। অনেক চেষ্টার পর বারাসাতে একটি কাপড়ের দোকানে চাকরি লাভ করেন। স্বামী বারাসাতে থাকায় দীপা তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কাছে একাই থাকতেন আর নীরবে মেনে নিতেন যাতনা। নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় দীপার গর্ভে যখন তাদের প্রথম সন্তান আসে। এসব দেখে তার শ্বশুর সিদ্ধান্ত নেয় দীপাকে বাংলাদেশে তার বাবার বাড়িতে রেখে আসার। স্বামীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না করেই দীপাকে অনেকটা বাধ্য হয়েই শ্বশুরের সঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল বাবার বাড়িতে। বাংলাদেশে ফিরে দীপা অনেকটা নিশ্চিতই ছিলেন যে তার স্বামী হয়তো আর তার কাছে ফিরে আসবে না। কিন্তু তার এই ধারনা ভেঙ্গে দিয়ে তার স্বামী দিলীপ মন্ডল মামাদের পরামর্শে বারাসাতের চাকরি ছেড়ে সাত মাস পরেই বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ১৯৯৩ সালের কথা। এরই মধ্যে জন্ম নেয় তাদের প্রথম ছেলে সন্তান।

বাংলাদেশে ফিরে এসে স্বামী মামাদের সহযোগিতা নিয়ে কাঠের লগের ব্যবসা শুরু করেন। শুরু হয় নতুন সংসার ও নতুন জীবন। স্বামীর ব্যবসা ধীরে ধীরে ভালো হতে থাকে। সংসারের অভাব দুর হয়। ফিরে আসে স্বচ্ছলতা। স্বামীর উৎসাহে দীপা আবার পড়াশুনা শুরু করেন। ১৯৯১ সালে এস.এস.সি. পরীক্ষা

দেয়ার কথা ছিল। ভারতে চলে যাওয়ার কারণে দেয়া হয়নি। ১৯৯৩ সালে যশোর জেলা স্কুল থেকে প্রাইভেটে এস.এস.সি. পাশ করেন । এরপর ১৯৯৫ সালে যশোর সিটি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৯৮ সালে দীপা তার দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। সংসার ও সন্তান দেখশুনার কারণে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি দীপার। সংসারে স্বচ্ছলতা আসায় যশোরে দীপর বাবার বাড়ির কাছে বাড়ি ভাড়া করেন তার স্বামী।

এতো চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যখন সুখের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন দীপা তখনই ভয়াবহ এক বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয় তাকে। ১৯৯৯ সালের ২০মে সড়ক দুর্ঘটনায় তার স্বামী মারা যান। দুর্ঘটনাটির পর চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন তিনি। দু'টি সন্তানকে মানুষ করবেন কীভাবে, সংসার চালাবেন কীভাবে, বুঝে ওঠতে পারছিলেন না। স্বামীর সঞ্চিত টাকা দিয়েই সংসার চলছিল। পরিবার-আত্মীয় স্বজনরা চাকরি খোঁজার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু, দীপা জানতো পড়ালেখা বেশিদুর না করার কারণে ভালো কোনো চাকরি তিনি পাবেন না। এই লেখাপড়া সম্বল করে যদিও চাকরি পান, তা দিয়ে সন্তানদের ভালোভাবে মানুষ করতে পারবেন না। তাই অন্যকিছু করার কথা তিনি ভাবেন। কিন্তু, কোনো ধরণের অভিজ্ঞতাই তার জানা নেই। এমনকি যশোর শহরের সব জায়গাও তিনি চিনতেন না।

শুধু সাহস ও ২হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে ৫জন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ২০০০ সালের মে মাসে তিনি শুরু করেন সেলাই এর কাজ। তখন মাসে মাত্র ১হাজার টাকা আয় হতো। বাড়িতে বসেই চলতে লাগলো এই কার্যক্রম। সেলাই কার্যক্রম করতে গিয়েই যশোর শহরের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। তাদের পরামর্শে ২০০১ সালে যশোর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে "অংকুর মহিলা উন্নয়ন সংস্থা"- নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

সময়ের সাথে সাথে সেলাই কার্যক্রমে মেয়েদের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। কিন্তু, যশোরের স্থানীয় বাজার কাজের প্রসার ঘটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই আয় বাড়ানোর জন্য যশোর উপশহরের 'যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে ২০০২ সালে তিন মাসের জন্য হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু পালনের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর স্বামীর জমানো ৪০হাজার টাকা এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ৩০হাজার টাকা লোন নিয়ে শুরু করেন পোলট্রি খামার। ভালই চলতে লাগলো খামার ব্যবসা। মাসে আয় হত ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা।

এরই মধ্যে দেখা হয় উজ্জীবক হোসনে আরার সঙ্গে। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ধারনা দেন দীপাকে। দীপা উৎসাহী হয়ে ২০০৪ সালে ৩শ'৯২তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। চারদিনের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ তার জীবন সংগ্রামে নতুন আলোর সন্ধান দেয়। প্রশিক্ষণে আত্মশক্তি ও নারীর ক্ষমতায়নের আলোচনা তার মনে দাগ কাটে। তিনি অনুধাবন করতে পারেন এখন পর্যন্ত যে জীবন সংগ্রামে টিকে আছে

তাতো আত্মশক্তির বদৌলতেই। মানুষের আত্মশক্তিই যে, জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার মূল পুঁজি, তা তার উপলব্ধিতে আসে। নারীর ক্ষমতায়নের আলোচনা তাকে মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছে বলে অনুভূতি ব্যক্ত করেন। প্রশিক্ষণ শেষে নতুন উদ্যোমে নিজের পরিবার এবং তার মতো অনেক নারীর জন্য কিছু করার সংগ্রামে নেমে পড়েন।

প্রথমেই পরিকল্পনা করেন তার হস্তশিল্পের ব্যবসার সম্প্রসারন করার। কারন তিনি অনুধাবন করতে পারেন এটা করতে পারলে একদিকে তার আয় যেমন বাড়বে, অন্যদিকে অনেক নারীর কর্মসংস্থান করা যাবে। এরই সূত্র ধরে উজ্জীবক অনুপমা মিত্রের সঙ্গে রাজধানী ঢাকায় গেলেন এসব পণ্যের বড় বাজার খোঁজার জন্য। নিজের অদম্য চেষ্টার জোরে এই কাজে সফল হন তিনি।

২০০৬ সালের প্রথম দিকের কথা। অনেক জায়গা থেকে অর্ডার সংগ্রহ করেতে সক্ষম হন তিনি। এই সকল অর্ডারের কাজে তিনি প্রায় ১০০ জন নারীকে কাজ করার জন্য সম্পৃক্ত করেন। তখন মাসিক আয় হতো প্রায় ৫হাজার টাকা। আর যে সকল মেয়েরা তার অর্ডারের কাজ করতো, তারাও বাড়িতে বসেই প্রায় ৭শ' থেকে ২ হাজার টাকা আয় করতো। জীবন সংগ্রামের এই পথচলা কখনই মসৃন ছিল না দীপার। ২০০৫ সালের শেষ দিকে পোল্ট্রি খামার ব্যবসায় মন্দার কারণে তাকে বন্ধ করে দিতে হয় খামারটি। তখন থেকেই পুরো সময় দেয়া শুরু করেন হস্তশিল্পের ব্যবসায়। সাফল্যও পেয়েছেন তিনি।

বর্তমানে প্রায় ২শ'৪০ জন দরিদ্র নারীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যশোর পৌরসভার মধ্যে ৪০ জন, বাঘারপাড়ার ৪০ জন, চাঁচড়া ইউনিয়নের ৮০ জন এবং বন্দবিলা ইউনিয়নের ৮০ জন নারী এই কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে। যাদের মধ্যে আছে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, গৃহিনী ও ছাত্রী। তাদের মাসিক আয় ১হাজার টাকা থেকে প্রায় ২হাজার ৫শ'টাকা পর্যন্ত। তারা

বাড়িতে বসেই নিজ কাজের পাশাপাশি কাজ করে আয় করতে পারছেন। বর্তমানে দীপার মাসিক আয় প্রায় ২০হাজার টাকা। ঈদ ও পহেলা বৈশাখের সময় আয় বেড়ে যায়। তখন আয় হয় প্রায় ৪০হাজার টাকা আয় করেন তিনি।

মমতা, তানিয়া, দিতির মত অনেক নারীই এখন তার এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছেন। অনেক ছাত্রীই ছিল দারিদ্রের কারণে যাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেত। তারাই এখন নিজের আয়ে লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছে এবং পরিবারকে সহায়তা করছেন। অনেক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নারী নিজের আয়ে সংসার চালানোর পথ খুঁজে পেয়েছেন। অনেক গৃহিনীর আয়ের অর্থ তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার কাজে ব্যয় হচ্ছে। তারা স্বপ্ন দেখছেন নতুন দিনের। উপার্জনকারী নারীদের মর্যাদা বেড়েছে পরিবার ও সমাজে।

২শ' ৪০জন জন নারীর এই কর্মকান্ডকে সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় সমবায় করেন দীপা। প্রতিটি এলাকায় ছোট ছোট দল আছে এবং এসব দলের একজন দলনেতা আছে। এসকল দলনেতাদের মাধ্যমেই তিনি সকল কার্যক্রম সমন্বয় করেন। দলনেতারা নিজে কাজ করার পাশাপাশি সকল সদস্যের কাজ তদারকি করেন। এই বাড়তি কাজের জন্য লভ্যাংশের একটি অংশও পান তিনি। দলের সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করা হয়। তারপর বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার সংগ্রহ করেন তিনি। এরপর ডিজাইন, কাপড়, সুতা ও অন্যান্য সামগ্রী দলনেতার মাধ্যমে সরবরাহ করেন। সেখানেই তৈরি হয় নক্সী কাঁথা, বেডশিট, শাড়ি, কামিজ, ফতুয়াসহ অন্যান্য পণ্য। তৈরি হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেসব কাপড় আবার দলনেতার মাধ্যমে চলে আসে তার হাতে। তারপর মান নিশ্চিত হওয়ার পর চলে যায় অর্ডার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে। এভাবে দীপা অনেক ব্যাস্ততার মধ্যে তার

দিন কাটাচ্ছেন।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ সমাজের উন্নয়নের জন্য যে তাগিদ দিয়েছিল তা আরো শক্ত করার জন্য ২০০৮ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত যশোরে ২৪তম ব্যাচে নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ (ফাউন্ডেশন কোর্স) গ্রহণ করেন। প্রতিমাসেই ফলোআপ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন। এই প্রশিক্ষণ তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটিয়েছেন। নারীর অবস্থা ও অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর সংগ্রামে কাজ করে যাওয়ার একজন লড়াকু সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং তার গড়ে তোলা 'অংকুর মহিলা উন্নয়ন সংস্থা'র মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন।

হস্তশিল্পের ব্যবসার পাশাপাশি নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন বন্ধ, মা ও শিশুর পুষ্টি, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ সামাজিক শান্তি ও উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করছেন। যশোর পৌরসভা, চাঁচড়া ইউনিয়নে ও আরবপুর ইউনিয়নে তিনি এসকল কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন। সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ, সি.সি.ডি.বি, রাইট যশোর ও দুর্বার নেটওয়ার্ক এর সহযোগিতা পেয়েছেন সবসময়। নারীর প্রতি নির্যাতনের বিরুদ্ধেই এক প্রতিবাদী কণ্ঠ নারীনেত্রী দিপা মজুমদার।

আজকের এই সফলতার কারণে শুধু পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের কাছেই তার মর্যাদা বাড়েনি, বেড়েছে সমাজেও। বাংলাদেশ উইমেন চেম্বারের যশোর জেলা প্রতিনিধি তিনি। দুর্বার নারী নেটওয়ার্ক যশোর অঞ্চলের (৪টি জেলা-যশোর, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ) কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক এর যশোর জেলা কমিটির সদস্যও তিনি। এখন

অনেক নারী বিপদে পড়লে তার কাছে আসে, যাকে তিনি আগে কখনো দেখেননি। এটিই তাকে অনেক সন্তুষ্টি এনে দেয়। তিনি তাদের পাশে দাঁড়ান। নিজের জীবনের কাহিনী শোনান। লড়াই করার সাহস যোগান।

বর্তমানে গ্রামে মেয়েদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে চান তিনি। যেখানে গ্রামের দরিদ্র মেয়েদের প্রশিক্ষিত করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।

দীপা প্রত্যাশা করেন তার হস্তশিল্পের কাজের প্রসার ঘটানোর। তাদের তৈরি সামগ্রী বিদেশের বাজারে যাবে এবং অধিকসংখ্যক দরিদ্র নারীর আত্মকর্মসংস্থান হবে। তার এই প্রত্যাশা পুরোনের জন্য পরিকল্পনা করেছেন তিনি। ট্রেনিং সেন্টারটি গড়ে তোলার জন্য ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগও করেছেন তিনি।

দীপা মজুমদার দুই শতাধিক দরিদ্র নারীর জীবনে যে দীপশিখা ছড়াচ্ছেন, তা ছড়িয়ে পড়বে সহস্রাধিক দরিদ্র নারীর জীবনে দীপাবলীর মতো এই প্রত্যাশা শুধু দীপারই নয় আমাদের সকলের।

সফলতার সিঁড়িতে নাজমুন্নাহার

-মোঃ গিয়াসউদ্দীন

আমাদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে জন্মের পর থেকেই কন্যাশিশুদের প্রতি অযত্ন ও অবহেলা শুরু হয়। ফলে ছেলে শিশুদের তুলনায় কন্যাশিশুরা বেশি অপুষ্টির শিকার হয়। কন্যাশিশুদের মৃত্যুর হারও অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। গ্রামীণ সমাজে পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারনা প্রকট হওয়ার কারণে অধিকাংশ কিশোরীরাই চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ইতি টানতে হয় তার শিক্ষা জীবনের। কথাগুলো যেন পুঞ্জিভূত একরাশ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, গড় গড় করে উগরে দিলেন নাজমুন নাহার।

শান্ত স্বভাবের মেয়ে নাজমুন নাহার। বরিশাল জেলার খেপুপাড়া উপজেলায় একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে ১৯৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ডা. আবু বক্কর সিদ্দিক ও মা নজিবুন নেছা। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে নাজমুন নাহার দ্বিতীয়। নাজমুন নাহারের ইচ্ছা ছিল স্কুলে পড়ার কিন্তু মুখ ফুটে কথাটি বলার সাহস হয়নি কখনও। মেয়েদের পর্দা প্রথা মেনে মাদ্রাসা পড়তে হবে, এটা এই পরিবারের নিয়ম। অনিচ্ছা সত্বেও মাদ্রাসায় যাওয়া শুরু করতে হয় নাজমুন নাহারকে।

এরকম অনেক ইচ্ছাই অব্যক্ত রয়ে গেছে নাজমুন নাহারের। পরিবারের এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কড়া শাসনে নাজমুন নাহার ভিতরে ভিতরে বিষিয়ে ওঠে। এই রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই নাজমুন নাহার ১৯৯৪ সালে একটি মহিলা মাদ্রাসা থেকে দ্বিতীয় বিভাগে দাখিল পাশ করেন। এক প্রকার বিদ্রোহ করে পরিবারের নিয়ম ভেঙেই নাজমুন নাহার কলাপাড়া মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস কলেজে এইচ.এস.সি তে ভর্তি হন। এই প্রথম তাদের পরিবারের নিয়ম ভঙ্গ

হলো। পরিবার তার এই সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে গ্রহণ করলেন না। উচ্চ শিক্ষা দূরে থাক, নাজমুন তার শিক্ষা জীবনই রক্ষা করতে পারলেন না।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি নাজমুনের পরিবার বিলম্ব না করে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নাজমুন নাহার তার শিক্ষা জীবন বাচানোর জন্য দীর্ঘ এক বছর পরিবারের সঙ্গে সংগ্রাম করে অবশেষে পুরুষতন্ত্রের কাছে পরাজিত হয়ে ১৯৯৫ সালে বিয়ের পিড়িতে বসতে বাধ্য হন।

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের মোঃ সিরাজুল ইসলাম বিয়ে করেন নাজমুন নাহারকে। তখন সিরাজুল ইসলাম মূলত কোনো কাজ করতেন না। এরপর আবার মায়ের আচল ধরে চলা স্বভাবের ছেলে। স্বামী বেকার হওয়ায় পান থেকে চুন খসলে নানা ভাবে তাকে অপমান করা হয়। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ বুজে মানিয়ে চলার চেষ্টা করে

নাজমুন। স্বামীকে কিছু করার তাগিদ দেন। কিন্তু নাজমুনের স্বামী স্বল্প শিক্ষিত হওয়ায় কাজের জোগাড় করতে পারেনা। দিন যত যায় সংকটের মাত্রাও বাড়তে থাকে। এরকম এক পর্যায়ে স্বামী সিরাজুল ইসলাম তার মায়ের কাছে ছোটখাট কিছু করার জন্য কিছু টাকা চায়। মা টাকা চাওয়ার বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি এবং দোষটি যেয়ে বর্তায় নাজমুনের ওপর। সিরাজুলের অবস্থা শ্যাম রাখি না কুলরাখি। মাকেও কিছু বলতে পারে না আবার বউ এর কষ্টও সহ্য করতে পারে না।

কিছু একটা করার আশায় নাজমুন নাহার স্বামীকে নিয়ে ১৯৯৭ সালে বাবার বাড়ী বরিশালে চলে যান। ভাইদের সহযোগিতায় তার স্বামী চাউলের ব্যবসা শুরু করে। এভাবেই আবার শুরু হয় তাদের নতুন সংসার জীবন। তারা যেন সুখের দেখা পেল। এরই মধ্যে ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে নাজমুনের কোলজুড়ে আসে ফুটফটে পুত্র সন্তান। স্বামীর ব্যবসা ও শিশু সন্তানকে নিয়ে ভালই কাটছিল তাদের দাম্পত্য জীবন। হঠাৎ করেই সিরাজুলের মাথায় পুরুষতন্ত্রের ভূত চেপে বসল। সন্তান যখন বড় হবে জানবে সে তার নানাবাড়িতে বড় হচ্ছে। তখন তার আর সন্তানের কাছে জবাব দেওয়ার মতো কিছু থাকবে না। তাই সন্তানের পরিচয়ের জন্য তিনি নিজ বাড়ী শ্যামনগরে চলে যেতে চান। যেই কথা সেই কাজ। ৪ মাসের শিশু পুত্রকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে নাজমুনকে আবারও ফিরে যেতে হয় শ্বশুর বাড়ী। সুখের নাগাল যেন তার অধরাই রয়ে গেল। এলাকায় ফিরে এসে সিরাজুল আবারও বেকার হয়ে পড়ল। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। আবারও নির্যাতন। নাজমুন যেন ঘোর অন্ধারে পড়ল। একদিকে নিজেদের জীবন অন্যদিকে সন্তানের অনাগত ভবিষ্যৎ। তার ভেতরে ক্ষরণ বাড়তে থাকে। অবশেষে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করেই শ্যামনগরে একটা নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরী নেন তিনি। কিন্তু বাধ সাধে তার শ্বাশুড়ী। মেয়েদের চাকরি করলে নাকি তাতে

মান-সম্মান নষ্ট হয়। বাড়ীর বউ চাকরি করবে। তার শ্বাশুড়ী কোনোভাবেই মেনে নিতে পারল না। এরকম অবস্থায় যখন সিরাজুল তার মায়ের অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ করল না। ঘটনাটি নাজমুনকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। স্বামী সন্তান নিয়ে নাজমুন একটি ঘর ভাড়া করে ২০০৫ সাল থেকে শ্যামনগর উপজেলা সদরে বসবাস শুরু করেন। নাজমুনের উৎসাহে সিরাজুল সামান্য কিছু জমি বন্ধক রেখে ডিমের ব্যবসা শুরু করেন। নাজমুন নাহার আগে থেকেই সেলাই এর কাজ জানত এবং তার একটি সেলাই মেশিনও ছিল। স্বামীর ক্ষুদ্র ডিমের ব্যবসা এবং একটি সেলাই মেশিনকে সম্বল করে শুরু করে তাদের নতুন জীবন যুদ্ধ। কিন্তু জীবন চলার পথ এতো মসৃন নয়। কয়েকটি ডিম বিক্রির লাভের টাকা আর দুএকটি কাপড় সেলাই এর টাকায় সংসার চালানো সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। নাজমুনের সামনে গভীর অন্ধকার নেমে আসে। একপ্রকার বাধ্য হয়েই ঘরের বাইরে পা রাখতে হয় নাজমুনকে। প্রতিদিন বিভিন্ন অফিসে ধন্যা দেওয়া, একটি কাজের আশায়। এভাবেই কাজ খুজতে গিয়ে দেখা হয় শ্যামনগর নকশীকাঁথা মহিলা সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক চন্দ্রিকা ব্যানার্জীর সাথে। চন্দ্রিকা ব্যানার্জী তার জীবনের আদ্যপন্ত শুনে তাঁর প্রতিষ্ঠানের কিছু সেলাই এর কাজ দেন তাকে। চন্দ্রিকা ব্যানার্জী নানাভাবে নাজমুনকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন। এভাবেই বেশ কিছু দিন কেটে যায়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নাজমুনের সেলাই কাজ নিয়ে নক্সীকাথার অন্য কর্মীরা অভিযোগ করেন। নাজমুনকে নিয়ে চন্দ্রিকা ব্যানার্জীও একটু সমস্যায় পড়ে যান। চন্দ্রিকা ব্যানার্জী নাজমুনকে নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের দারস্থ হন। সময়টি আনুমানিক ২০০৬ সাল, শ্যামনগরে তখন হাঙ্গার প্রজেক্টের আয়োজনে চলছিল দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সেলাই প্রশিক্ষণ। নাজমুনকে প্রশিক্ষণটিতে ভর্তি করিয়ে দেন। তিনমাস ধরে তিনি সেলাই ও কারচুপির ওপর প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করেন। এরপর নাজমুনের কাজ নিয়ে কেউ অভিযোগ করেনি। এখন সে নক্সীকাথাসহ বিভিন্ন এনজিও'র সেলাই

কারচুপির নিয়মিত প্রশিক্ষক। কোনো প্রতিষ্ঠানে সেলাই কারচুপির প্রশিক্ষণ হলে সবাই এখন তাকেই ডাকে। প্রশিক্ষক হিসেবে নাজমুন প্রতি মাসে প্রায় ১৪হাজার টাকা মাসিক রোজগার করে। সচ্ছলতার চাকা একটু একটু ঘুরতে থাকে নাজমুনের সংসারে।

ইতিমধ্যে হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে নাজমুনকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণসহ আত্মউন্নয়নের ওপর কতকগুলো প্রশিক্ষণ করিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে তার ধ্যানধারনা গুলোও পাল্টাতে থাকে। অবসরে তার মতো পিছিয়ে পড়া মানুষকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে নাজমুন।

এই ভাবনা থেকেই পিছিয়ে পড়া নারীদের আত্মনির্ভর করার জন্য ২০১০ সালে গড়ে তোলে হতদরিদ্র নারী কল্যাণ সংস্থা। তার এই সংস্থার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬০ জন। মাসে ১০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে তারা সঞ্চয় করেন। এই সঞ্চয়ের টাকা থেকে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে তারা বিনা সুদে লোন প্রদান করেন। আর

এই টাকা নিয়ে বিভিন্ন অসহায়-সম্বলহীন সদস্যরা বসতবাড়িতে সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, ঠোংগা তৈরিসহ বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধক কাজ করে সাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। সংস্থার মাধ্যমে নাহার ওয়ার্ডভিত্তিক মেয়েদের আয় বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন ধরনের কাজ করান। যেমন কারচুপির কাজ, দর্জি, হস্তশিল্প, বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট তৈরি, ব্লক, বাটিক, মৌ চাষ সহ আরও অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ। এক সময়ের অসহায় নাহার এখন শ্যামনগরের অনেক অসহায় নারীর ভরসার প্রতীক হতে চলেছে। নাহার আরো এগিয়ে যেতে চান সময় সুযোগ হলে নিজের লেখাপড়াটা আরো এগিয়ে নিতে চান।

নাহারের উপলবদ্ধি, সংগ্রাম করতে হলে লেখাপড়া জানাটা জরুরিএই রকম একটা বিশ্বাসের জায়গা থেকেই নিজ বাড়ীতে ২০০৯ সালে গড়ে তোলে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র নাম দেন 'নাহার পাঠশালা' । এলাকায় ঘুরে ঘুরে লেখা-পড়া না জানা বয়স্ক নারী পুরুষদেরকে বুঝিয়ে নিয়ে আসে তার পাঠশালায়। তার পর হাতে কলমে পড়তে ও লিখতে শেখান। শ্যামনগরের প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে এখন নাহার পাঠশালার সুখ্যাতি।

নিবেদিত নার্গিস

-মো: আসলাম খান

"যখনই শুনি আশেপাশের কোনো মেয়ের বাল্যবিবাহ হতে যাচ্ছে আমার মধ্যে বসত করা ভিতরের মানুষটি স্থির থাকতে দেয় না। প্রতিবাদী করে তোলে আমাকে, আর আমিও চুপ করে বসে থাকতে পারি না। যতক্ষণ না বিয়েটি বন্ধ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনোভাবেই নিস্তার পাই না। এ ক্ষেত্রে কারও সাথে কোনো আপোস করার কথা চিন্তাও করতে পারি না, কারণ এ ক্ষেত্রে কোনো আপোস আমাকে ১৯ বছর আগের আমার জীবনের অন্য এক আপোসের কথা মনে করিয়ে দেয়। যে আপোসের জন্য জীবনের অনেক স্বপ্নকে হারাতে হয়েছে, পেছনে পড়ে থেকে দেখতে হয়েছে অন্যদের এগিয়ে যাওয়া।" নিজের জীবনে বাল্যবিবাহের শিকার হওয়ার পরিনামের কথা প্রসঙ্গে কথাগুলো বলেন ময়মনসিংহের নার্গিস। তার চোখের সামনে তার মতো অন্য একটি মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার হোক, নির্যাতনের শিকার হোক এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন না নার্গিস আক্তার। কিন্তু আজকের এই নার্গিসের জীবন চলার পথটি মোটেও সহজ ছিল না।

ময়মনসিংহ জেলা শহর পৌরসভা থেকে রিক্সায় দুরুত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার। ময়মনসিংহ শহরের আকুয়া দক্ষিণ পাড়ায় একটি সাধারণ পরিবারে ১৯৮০ সালে নার্গিসের জন্ম। বাবা মোঃ মোসলিম উদ্দিন পেশায় একজন ব্যবসায়ী এবং মা মোছাঃ রেজিয়া খাতুন একজন গৃহিণী। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে নার্গিস তৃতীয়। ছোটবেলা থেকেই নার্গিস বেশ চঞ্চল প্রকৃতির ছিল।

নার্গিসের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ কনসার্ন নামক একটি বেসরকারি সংস্থার স্কুলের মাধ্যমে। বেশ আনন্দ উচ্ছাসের মধ্য দিয়েই চলছিল নার্গিসের জীবন। কিন্তু ১৯৯৩ সালে তার জীবনে নেমে আসে এক ঘূর্ণিঝড়। নার্গিস তার বান্ধবীর বাড়ি ফুলপুরে বেড়াতে যায়। বান্ধবীর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে মোফাজ্জল হোসেন নামের একজন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। নার্গিস তখন মাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। অনিচ্ছা সত্বেও পারিবারিক ভাবেই

১৯৯৩ সালে নার্গিসের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন নার্গিস। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নার্গিস কথা বলার সাহস করে নাই। জীবনের অনেক কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে শুরু করতে হয় সংসার। যার কারণে সংসার জীবনের যাতাকলে পড়ে নার্গিসের আর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়া হয় নাই। তখন নার্গিসের বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তেমন কোনো ধারনাই ছিল না। কোনো মেয়ের যেন লেখাপড়া বন্ধ করে বিয়ের পিড়িতে বসতে না হয় এমনটাই মনে করেন নার্গিস।

বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ির মানুষ যৌতুকের দাবিতে ও কিছু তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নার্গিসের ওপর অত্যাচার করতো। তখন তার মনে হতো যদি নিজেকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা যায় তাহলে হয়তো এই রকম অত্যাচারের শিকার হতে হবে না। এই উপলব্ধি থেকে ১৯৯৪ সালে স্বামীর কাছে বাবার বাড়ি বেরাতে যাওয়ার কথা বলে ছয় মাসের কন্যাশিশুকে নিয়ে ফিরে যান। স্বাবলম্বী হয়ে স্বামীর কাছে ফিরে যাবেন বলে কনসার্ন বাংলাদেশ থেকে ৩ মাসের একটি সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া কনসার্ন

বাংলাদেশ থেকে মাসে ৩০কেজি চাল ও তার সন্তানের খাবারও দেওয়া হতো। এরপর বিভিন্ন জায়গায় হস্তশিল্পের কাজ করে আয় করা শুরু করেন। পাশাপাশি নারীদের সংগঠিত এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ১৯৯৪ সালে একটি সমিতি গঠন করেন। এরমধ্যে তার স্বামী কয়েকবার শ্বশুরবাড়ি ফিঁরে যেতে অনুরোধ করলে নার্গিস পুরোপুরি স্বাবলম্বী হয়ে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। এর কিছুদিন পর নার্গিস তার শ্বশুর বাড়ি গিয়ে জানতে পারেন তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। অনুমতি না নিয়ে আমিনা নামের একজনকে দ্বিতীয় বিয়ে করায় নার্গিস মামলা করেন। কিন্তু মামলায় উকিলের সহযোগিতা না পাওয়ায় তিনি নিরুপায় হয়ে পড়েন। শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাওয়ার পর আমিনা তাকে মেনে নিতে পারে না। ফলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন নার্গিস আমিনার কাছে। আমিনা নার্গিসকে মেনে নিতে না পেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে।

এতো কিছুর পরও পারিবারিক সিদ্ধান্তে নার্গিস তার স্বামীর সাথে সংসার করতে থাকেন। নার্গিস তার সংসার আরও সুন্দরভাবে চালানোর জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন ১৯৯৮ সালে ৩ মাসের শাক-সবজি উৎপাদনম,

পোলট্রি, ডেইরি, মৎস চাষ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ করেন। শৈশব থেকেই নার্গিসের স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে মানুষের সেবা করার। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে তাকে প্রতিবাদী করে তোলে। স্বামীর বাড়ীতে গিয়েও সমাজসেবামূলক কাজ অব্যহত রাখেন। ২০০২ সালে "আমাদের প্রয়োজন সমাজ কল্যাণ সংগঠন" নামে সমিতির রেজিস্ট্রেশন করেন। নার্গিস সমিতির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা। সমিতিতে মোট ৫০টি দল আছে। মোট ৩০জন পুরুষ এবং ৭৭০জন নারী সর্বোমোট ৮০০ সদস্য। বর্তমান সমিতির পুঁজি ৩০লক্ষ টাকা। প্রতি সপ্তাহে ২০টাকা টাকা হারে সঞ্চয় করেন। সদস্যরা নিজেদের মধ্যে লোন নিয়ে প্রায় সবাই আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। প্রত্যেক দলে ১১ সদস্যের ১টি পরিচালনা টিম আছে, এবং এ ছাড়া প্রত্যেক দল থেকে ১জন করে টিম সিভাপতির সমন্বয়ে ৫০ সদস্যের একটি কমিটি আছে। এই কমিটির মাধ্যমে সমিতিটা পরিচালিত হয়।

সমিতির পাশাপাশি আরও কিছু নতুনভাবে করার কথা চিন্তা করতে থাকেন। এ জন্য সময় প্রদীপ সমাজ কল্যাণ সংগঠনের নেত্রী মর্জিনা তাকে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ২০০৬ সালে ৯শ'৬তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পর আত্মবিশ্বাসী হয়ে ভাবতে শুরু করেন যে তিনি একা নন। কোন নারী যেন আর নির্যাতিত না হয় সেই জন্য তিনি তাদেরকে সংগঠিত করে কাজ করবেন বলে পরিকল্পনা করেন।

পরবর্তীকালে নিজে ৬০ জনকে নিয়ে উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এলাকার অনেক মানুষকে সম্পৃক্ত করেন। ২০০৭ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের নারী নেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া অসহায় নারীদের নিয়ে কিছু করবে চিন্তা করেন। নার্গিস নিজের উন্নয়নের জন্য ২০০৮ সালে ব্র্যাকে স্বাস্থ্য কর্মী পদে চাকরি নিলেন। নিজের উন্নয়নের পাশাপাশি মহিলাদের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন তিনি।

নার্গিস তার এলাকায় মায়ের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য প্রথমে গর্ভবতী মা

চিহ্নিত করেন তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও সেবা প্রদান করেন। তিনি তার এলাকার থানাতে ১৩৯২টি নবজাতক শিশু ও মায়েদের সেবা করেছেন। ৬৩টি গর্ভবতী মাকে সরাসরি সেবা প্রদান করেছেন। তাদেরকে নিয়মিত চেকআপ করাতে পরামর্শ দেন। এলাকার মহিলারা এখন আগের তুলনায় অনেক বেশী সচেতন হয়েছে। বর্তমানে আকুয়াতে আর নবজাতক কোন শিশু মারা যায় না।

নার্গিস নিজে যেহেতু বাল্যবিবাহের স্বীকার সেহেতু আর কোন মেয়ে যেন বাল্য বিয়ের স্বীকার না হয় সেজন্য তিনি তার এলাকায় উঠান বৈঠক, সভা, সমাবেশ বিভিন্ন দিবস উদযাপন করে আসছেন। গত এক বছরের হিসাব অনুযায়ী তিনি ২০টিরও বেশি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন। যৌতকমুক্ত বিয়ের ব্যবস্থা করেন প্রায় সমান সংখ্যক। তার ভাষায় গোটা আকুয়া দক্ষিণপাড়াই এখন বাল্যবিবাহমুক্ত এলাকা। যেখানেই নারী নির্যাতন সেখানেই নার্গিসের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।

নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি ৫নং ওয়ার্ডের কমিউনিটি বেইজ পুলিশিং কমিটি সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২০১০ সালে আক্টোবর মাসে পুলিশ ষ্টাফ কলেজ বাংলাদেশ থেকে ৪দিন ব্যাপী Human & Humanitarians Law প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এলাকার নিরাপত্তা বিষয়ক সকল সিদ্ধান্তমুলক সভায়ই আন্যান্যদের সাথে তারও ডাক পরে।

নার্গিস আক্তার সমাজের পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ ও নির্যাতিত মহিলাদের সাথে কাজের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চান। পাড়ি দিতে চান আরো অনেক পথ। তিনি এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান যেখানে কোন বাল্য বিবাহ থাকবে না, নারীরা পরিবারে,সমাজে নির্যাতিত হবে না। ভবিষ্যতে কেউ যেন নির্যাতনের স্বীকার না হয় সে জন্য আমৃত্যু পর্যন্ত নার্গিস কাজ করে যাবেন।

নার্গিসের পথচলা

-মোঃ শামসুদ্দীন

১৯৭৬ সালে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন নার্গিস। সমাজ, সংসার, বিয়ে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত অবস্থায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় নওগাঁর বর্ষাইল ইউনিয়নের মল্লিকপুর গ্রামের মইনুদ্দিনের মেয়ে নার্গিসকে। মা-বাবার অভাবের সংসারে এক রকম বোঝা মনে করে মহাদেবপুর কলোনির আরেক দরিদ্র পরিবার আনিসুরের ছেলে গোলাম রাব্বানীর সঙ্গে বিয়ে দেন নার্গিসকে।

কিছু দিন সংসার করার পর নার্গিস বুঝতে পারেন তার স্বামী মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন। তিনি কোনো কিছু মনে রাখতে পারে না এবং কোনো ভারী কাজ করতে পারে না। অভাবের সংসারে বেকার স্বামী ও ছেলের বউ অল্প সময়ের মধ্যেই মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে গিয়েছিল শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কাছে। পরিবারে প্রতিনিয়ত ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর বাঁকা কথা ছিল নার্গিসের প্রতিদিনের উপহার। শত কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্যেও শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও স্বামীর মন যুগিয়ে চলতেন নার্গিস। কারণ নার্গিস বুঝে গিয়েছিল অসুস্থ বেকার স্বামীর স্ত্রী হিসেবে এসব মানিয়ে চলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ইতিমধ্যে সংসারে একজন অতিথির কথা জানান দেয় নার্গিসকে। এই আগমন বার্তায় সাধারণত সকল নারীরই খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু নার্গিস খুশি হতে পারেননি। বরং গভীর দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হন তিনি। নিজেদেরই চলে না, আবার একজন অতিথি। তারপরও নতুন অতিথিকে বাধ্য হয়ে স্বাগত জানাতে হয়। জন্ম নেয় তাদের প্রথম সন্তান জান্নাতুন। অনেক কষ্টের মধ্যেও এক রকম চলছিল তাদের সংসার জীবন।

কিন্তু এই চলে যাওয়ার চিরস্থায়ী ইতি টানলেন নার্গিসের শ্বশুর-শ্বাশুড়ী। তাদেরকে সংসার থেকে আলাদা করে দেন। অক্ষম ও অসহায় স্বামীকে নিয়ে

নার্গিস পড়ে যান মহাবিপদে। কোনো উপায় না পেয়ে এক প্রকার বাধ্য হয়েই অসুস্থ স্বামীকে কাজে নামতে হয়। স্বামী বাজারের বিভিন্ন দোকানে ছোট-খাট কিছু কাজের মাধ্যমে যে সামান্য কিছু আয়-রোজগার করেন তা দিয়ে কোনোরকম দিনকাটে তাদের। এক পর্যায়ে স্বামীর মানসিক রোগ আরো বেড়ে যাওয়ায় তাকে আর কেউ কাজে নিতে চায় না। বাইরে বের হতে হয় নার্গিসকে। বিভিন্ন বাড়ীতে ঠিকা ঝিয়ের কাজ করে সংসার চালাতে হয় তাকে। মানুষের দয়া ও চেয়ে চিন্তেই তিন জনের মুখে খাবার জোগার করতে হয় তাকে। এত কষ্টের কথা লজ্জায় কাউকে বলতেও পারে না, মনে হয় পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই অর্থহীন।

ঠিক এই রকম অবস্থায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের নারী নেত্রী শাহানাজ আক্তার 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণ' নেওয়ার পরামর্শ দেন নার্গিসকে। প্রশিক্ষণটি সম্পর্কে জানার পর নার্গিস রাজি হয়। কিন্তু বাঁধ সাধে রেজিস্ট্রেশনের পঞ্চাশ টাকা নিয়ে। প্রশিক্ষণটি করতে গেলে পঞ্চাশ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয়। রেজিস্ট্রেশন ফি এর কথা শুনে আবারো অসহায় হয়ে পড়েন নার্গিস। অভাবের সংসারে এই ফি এর টাকা কোথা থেকে জোগাড় করবেন। প্রশিক্ষণের বিষয় গুলো বিস্তারিত জানার পর প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের জন্য প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল তার। রেজিস্ট্রেশন ফি জোগাড় করতে গিয়ে নিরুপায় হয়ে প্রতিবেশি একজনের নিকট থেকে ধার করে পঞ্চাশ টাকা। এরপর নার্গিস অংশ গ্রহণ করে ১৫শ'১২তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। চারদিন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে ধীরে ধীরে তার ভেতর আশার সঞ্চার হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নিজের মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং তার ভেতর থেকে হতাশার কালো মেঘ দুরিভূত হতে থাকে।

নিজে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরল নার্গিস। নিজের আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে, দৃঢ়মনোবল নিয়ে কর্মসংস্থানের পথ খুঁজতে থাকেন তিনি। এরপর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় দুই মাসের

সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ শেখেন।

প্রশিক্ষণের পর সেলাই মেশিন কিনতে না পারায় কাজ শুরু করতে পারছিলেন না। এক সময় একজন প্রতিবেশির মেশিন ভাড়া নিয়ে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন তিনি। কাপড় কেনার মতো নিজের টাকাও নেই আবার প্রথমদিকে খুব একটা কাজের অর্ডারও পেত না, নিজে অন্যদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজের অর্ডার নিয়ে আসত। বর্তমানে কোনো ধরণের কাজের অর্ডার পেতে আর কারো বাড়ি যেতে হয় না, বিভিন্ন বাড়ি থেকে এসে কাজ দিয়ে যায়। তিনি এখন বাড়িতে বসেই মেয়েদের সকল ধরনের পোশাক তৈরির কাজ, ছোট বাচ্চাদের প্যান্ট, ফ্রকসহ নানা ধরনের কাজের অর্ডার পান, এমনকি বাজারের দোকানের কাজেরও বাড়িতে অর্ডার পেয়ে থাকেন। সে বাড়িতে বসে প্রতি মাসে প্রায় ৫ হাজার টাকা আয় করেন। নিজের রোজগারের টাকা দিয়ে একটি গাভী কিনেছেন। গাভীর দুধ বিক্রি করে প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ টাকা বাড়তি আয় হচ্ছে। বাড়ীতে পুষ্টির চাহিদাও মেটাতে পারছেন। পরিবারে আগের মতো আর দ্বন্দ নেই, নেই পূর্বের সেই হতাশা। মেয়ে জান্নাতুন পড়াশুনার পাশাপাশি মায়ের সেলাই এর কাজেও সহযোগিতা করে। স্বামী কিছু না করলেও এখন নিজের টাকায় ভালোই চলছে তাদের সংসার।

নার্গিস আরো পরিশ্রম করতে চান। এগিয়ে যেতে চান সামনের দিকে। তার বিশ্বাস পরিশ্রম করলে একজন মানুষ তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন।

একজন নিরুপমা

-এ এস এম আখতারুল ইসলাম

নিরুপমা দত্তের শৈশবের বেড়ে ওঠার গল্প আর দশটা মেয়ের মতো নয়। শৈশবেই নিরুপমা তার মাকে হারায়। আর তখনইনিরুপমা বুঝতে পারে যে জীবন কত কঠিন! মা ব্রজমালা দত্ত মারা যাওয়ার পর তিনি তার দিদিমার কাছে বড় হন। নিরুপমার বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ জেলার সদর ইউনিয়নে। সেখানেই তার বেড়ে ওঠা। বাবা প্রমোদ দত্ত কৃষি কাজ করতেন। নিরুপমার জন্ম ১৯৭৪ সালে।

মায়ের অবর্তমানে দিদিমা আর বাবার স্নেহে বড় হতে থাকেন নিরুপমা। বাবা তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু, এরই মধ্যে আরেকটি মৃত্যু সংবাদ নিরুপমার সব স্বপ্নকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। তার বাবা ইহলোক ত্যাগ করেন ১৯৮৪ সালে। আবারও কঠিন দুঃসময় নেমে আসে নিরুপমার জীবনে। মাকে হারিয়ে নিরুপমা বাবার হাত ধরে পথ চলছিলেন- সেই বাবাকে হারিয়ে তিনি হয়ে যান পথ হারা। এরপর বাবা মারা যাওয়ার শোক না কাটতেই কিছুদিনের মধ্যেই অকাল মৃত্যু হয় নিরুপমার দুই ভাইয়ের। কিন্তু এতো দুঃসময়ের মধ্যেও তিনি পড়াশুনা ছেড়ে দেননি। দিদিমার আর্থিক সহায়তায় কমলগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৫ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে মাধ্যমিক পাশ করেন। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের জন্য মাধ্যমিক পাশ করার পর কলেজে ভর্তি না হয়ে কমলগঞ্জ সরকারি শিববাজার ললিতকলা একাডেমি থেকে হস্তশিল্পের ওপর ১ বছরের একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৮৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার জন্য ভর্তি হন কমলগঞ্জ ডিগ্রি কলেজে।

দুই ভাই বোনের অভাবের সংসারে বাবার অকাল মৃত্যুতে পরিবারটি পথে বসবার উপক্রম হয়। সংসারের হাল ধরতে কলেজে পড়ার সময় নিরুপমা হীড বাংলাদেশ নামক এন.জি.ও'তে মাঠকর্মী হিসেবে যোগ দান করেন। নিরুপমার কঠোর পরিশ্রম উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি কাড়ে। ফলে বছরখানেকের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

কর্মজীবনে দক্ষতার দরুন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সময় ট্রেনিং এ অংশগ্রহণের সুযোগ পান নিরুপমা। এরমধ্যে রয়েছে তাঁতশিল্পের উপর বছরব্যাপি প্রশিক্ষণ, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণ, সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ক ও

বিভিন্নরকম দক্ষতা বাড়ানোর জন্য দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ।

অনেক সংগ্রাম আর কিছু সাফল্য সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় নিরুপমাকে। ১৯৯৭ সালে সুরঞ্জন দেবের সঙ্গে বিয়ে হয় নিরুপমার। সুরঞ্জন বিয়ের বেশকিছুদিন হীড বাংলাদেশে কর্মরত থাকলেও তার মায়ের অসুস্থতার জন্য পরে তিনি চাকরি থেকে অবাহতি নেন। বিয়ের পর নিরুপমার স্বামী সবসময়ই তাকে সকল কাজে সাহ ও আস্থা যেগিয়েছেন বন্ধুর মতো পাশে থেকে। এমনকি নিরুপমার চাকরি করা নিয়েও তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির কেউ বাধা দেয়নি। কিন্তু নিরুপমার সন্তান না হওয়ায় তার ওপর অমানুসিক নির্যতিন করেন তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী। কিন্তু নিরুপমা পরিবারে অর্থনৈক অবদান রাখার জন্য ধীরে ধীরে তার ওপর নির্যাতন বন্ধ করেন তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী। বর্তমানে তিনি ব্র্যাক এনজিও'তে মাসিক ৯হাজার টাকা মাসিক বেতনে ফিল্ড সুপারভাইজার হিসেবে কর্মরত আছেন।

২০১১ পরিচয় হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ-এর সঙ্গে। ১৮শ'৪০তম ব্যাচের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উজ্জীবক নিরুপমা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ক্ষুধামুক্তি আন্দোলনে একজন নিবেদিত কর্মী। তিনি এলাকার এমডিজি ভিত্তিক ক্যাম্পেইন ও সভা করে থাকেন। নিরুপমা শুধু উজ্জীবকই নন পাশপাশি একজন নারীনেত্রী। সমাজে তৃণমূল মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে তার গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি কমলগঞ্জ সুজন ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের একজন একনিষ্ঠ সদস্য। তিনি এসব ইউনিটের সভাগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন।

নিরুপমা তার চাকরির পাশাপাশি শ্বশুরবাড়ি হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে মৎসাচাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। নিরুপমা তার শ্বশুরবাড়ির পাশে প্রায় ৫ শতাংশের ছোট একটি পুকুরে মাছচাষ শুরু করেছেন। প্রথম পর্যায়ে একহাজার টাকার তেলাপিয়া জাতের মাছের পোনা পুকুরে ছাড়েন। বর্তমানে এগুলো তাঁর বাড়ির সবার প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পুরণ করে চলেছে। পরীক্ষামূলকভাবে এ চাষ সফল হলে তিনি পরবর্তীকালে পুকুর লিজ নিয়ে মৎসাচাষ শুরু করবেন বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

তিনি নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছেন নারীর তথা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের কল্যাণে। হয়তো এই নিরুপমার হাত ধরেই পথহারা পিছিয়ে পড়া মানুষেরা খুঁজে পাবে একদিন সফল মানুষ হিসেবে নিজেদের।

বৃষ্টি কাহিনী

- শারমিন আক্তার

কুলসুম আরা বৃষ্টি। বাবা পেশায় একজন কৃষক। মা গৃহীণি। মা-বাবার সাত ছেলে-মেয়ের মধ্যে কুলসুম ষষ্ঠ। ছোট্ট কুলসুম দেখতে অনেকখানি পতুলের মতোন। কুলসুম যখন প্রাথমিক শিক্ষার গন্ডি পেরিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু করেন তখনই শুরু হয় নতুন বিড়ম্বনা। স্কুলে যাওয়া আসার পথে প্রতিনিয়তই তাকে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। এই পরিস্থিতিতে কুলসুমের বাবা তার মেয়েকে নিয়ে সংকটে পড়ে যায়। অনেকটা নিরুপায় হয়েই বিড়ম্বনার হাত থেকে রক্ষা পেতে খুজে বের করে সহজ সমাধান। নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে গ্লাক্সো কোম্পানিতে চাকরিরত একজন ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয় কুলসুমের। বিয়ের তিন বছরের মাথায় তার কোল আলো করে আসে এক পুত্র সন্তান।

বিয়ের পর সুখ তার জীবনে দানা বাঁধতে না বাঁধতেই যেন কালবৈশাখীর দমকা হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেল সবকিছু। ভয়াল সময়টা এসেছিল তার বিয়ের মাত্র চার বছর পর ১৯৯৯ সালে। এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান তার স্বামী। স্বামী মারা যাওয়ার পর হতবিহ্বল হয়ে হয়ে পড়েন কুলসুম। দীর্ঘ একবছর এই অস্বাভাবিকতা বিরাজ করে তার মধ্যে। ধীরে ধীরে পরিবার ও প্রতিবেশীর সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় তিনি যেন সম্বিত ফিরে পান। সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে চিন্তা করেন, তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতেই হবে।

স্বামীর অফিস থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে জমি কিনে ছোট পরিসরে একটি বাড়ি করলেন, আর একটি সেলাই মেশিন কেনেন কুলসুম। এবং একটি টেইলার্স থেকে সাত মাসের একটি সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেন। এরপর তিনবছর কারিগর হিসেবে ঐ দোকানে চাকরি করেন। পরবর্তীকালে নিজের দক্ষতা ও

অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের বাড়িতেই টেইলারিং এর কাজ শুরু করেন ক্ষুদ্র পরিসরে। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দ্বিতীয়বার বিয়ের বিষয়টিকে একেবারেই প্রশ্রয় দেননি।

তার এই এগিয়ে চলার পথে এক পর্যায়ে সখ্যতা গড়ে ওঠে স্থানীয় নারীনেত্রী ও নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য রেহেনা আফরোজ শোভার। তার অনুপ্রেরণায় ২০১১ সালে কুলসুম অংশগ্রহণ করেন ১৬শ'৯৪তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণ থেকে তিনি 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ' সম্পর্কে অবগত হন এবং এর আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে নিজের চলার পথে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেন। হয়ে ওঠেন আরও বেশি বাস্তববাদী ও সমাজ সচেতন। কাজ শুরু করেন অবহেলিত ও হতদরিদ্র নারীদের নিয়ে। বিশটাকা মাসিক সঞ্চয়ের ভিত্তিতে ৪০জন নারীকে নিয়ে গড়ে তোলেন একটি নারী সংগঠন, যার নাম- বেলী মহিলা সমিতি। এ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে আয়মূলক কাজ, নারীর অবস্থা-অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তন, স্যানিটেশন কার্যক্রম, বয়স্ক ও শিশু

শিক্ষা প্রভৃতি। এ সংগঠনের মাধ্যমে কুলসুম নারীদেরকে আয়মূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। এছাড়া সংগঠনটি স্থানীয় একটি বেসরকারি সংগঠনের সহায়তায় গর্ভবতী মায়ের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান নিশ্চিত করে। এছাড়া পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে শিশুদের অপুষ্টতা দূরীকরণেও এ সংগঠন ভূমিকা রেখে চলেছে। কুলসুমের সক্রিয় সহযোগিতায়-ই এ সংগঠনটি এগিয়ে চলেছে।

এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেও রয়েছে তার সজাগ দৃষ্টি। তিনি চারজন শ্রমজীবী শিশু এবং দু'জন এতিম শিশুকে ভর্তি করে দিয়েছেন স্থানীয় কুয়েতী মাদ্রাসায়। ছয়জন শিশুর মধ্যে একজন মেয়ে ও পাঁচজন ছেলে।

কুলসুমের এসব কার্যক্রমের ধারা আরও বেগবান হয় 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'র বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ৬৮তম নারীনেত্রী ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। স্থানীয় নারীদেরকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আরও বেশি দক্ষ হয়ে ওঠেন তিনি।

বর্তমানে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বন্ধে এবং পারিবারিক বিরোধ মীমাংসায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। এসব সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাছেও তিনি হয়ে উঠেছেন সুপরিচিত। যারফলে ৪০দিনব্যাপী 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য'-কর্মসূচিতে রাস্তা নির্মাণে নিয়োজিত নারী ও পুরুষের কাজ তদারকিসহ তাদের জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক যেন তারা ঠিকমত পান সেদিকেও তিনি লক্ষ্য রাখেন। ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় এলাকার হতদরিদ্র চারটি পরিবারকে গৃহ নির্মানের জন্য অর্থ প্রদান করেন। এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ফলে তিনি স্থানীয় নারী-পুরুস সকলের কাছে হয়ে উঠেছেন গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত। তার প্রতি গ্রামের মানুষের রয়েছে পূর্ণ আস্থা। কুলসুমের এই বিশ্বস্ততা এবং গ্রহণযোগ্যতার কারণেই স্থানীয় খানজাহান আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

অভিভাবক সদস্য নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এর ফলে বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের সুযোগ পান।

তিনি তার টেইলারিং ব্যাবসাকে আরও বড় স্বপ্ন দেখেন-যেন এখানে অনেকের কর্মসংস্থান হয়। বৃষ্টির আশা টেইলারিং ব্যাবসার পাশাপাশি তিনি একটি টেইলারিং ট্রেনিং সেন্টারও গড়ে তুলবেন। যার মাধ্যমে বেকার নারী-পুরুষকে তিনি দিতে পারবেন কর্মের সন্ধান। সবকিছুর ওপর তিনি স্বপ্ন দেখেন একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। সেই লক্ষ্যেই বৃষ্টি তার ক্ষুদ্র পরিসর থেকে কাজ শুরু করেছেন খুলনার জলমাই ইউনিয়নের হরিণটানা গ্রামটিতে। সারাদেশে না পারলেও অন্তত তার নিজের এলাকায় তিনি একটি উন্নয়ন করার চেষ্টা করছেন। কুলসুমের কাজের মাধ্যমে তিনি মানুষ হিসেবে স্বার্থক হতে চান, যে স্বার্থকতায় তিনি হরিণটানাবাসীর কাছে বেঁচে থাকবেন দিনের পর দিন।

ধারাবারিষার ভারতী

-মোঃ শামসুদ্দীন

নাটোরের চলনবিল অধ্যুষিত গুরুদাসপুর উপজেলার ধারাবারিষা ইউনিয়নের সিধুলী গ্রামের মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারেই জন্ম ভারতী রানীর। একেবারে উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে না হলেও পড়া লেখা জানা পরিবারেই জন্ম তার। শিক্ষিত ও স্বচ্ছল পরিবারে জন্মানোর পরেও মেয়ে হয়ে জন্মানোই যেন তার আজন্ম পাঁপ। এক দিকে কট্টর হিন্দু পরিবার, অপর দিকে মেয়ে হয়ে জন্মানোর কারণে পড়াশুনার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই বলেই মনে করতেন তার মা-বাবা। এর জন্য যে শুধু মা-বাবা দায়ী তা নয়, তার থেকেও বেশি দায়ী ছিল তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা। সেই সময়কার পিছিয়ে পড়া সমাজের নির্মম নিয়মের শিকার হতে হয় ভারতীকে। মুলত প্রাইমারি পাশ করার পর থেকেই মা-বাবার মুখে শুনতে হচ্ছিল মেয়ে বড় হচ্ছে, মেয়েদের বেশি পড়া লেখা করার দরকার নেই। এলাকার মানুষ কানাঘুষা করছে নানা ধরনের অনাকাঙ্খিত কথা বার্তা নিয়ে। যা প্রতিনিয়ত ভারতীকে শংকিত, আতংকিত করেছে। এই বুঝি তার স্কুলে যাওয়া আর হলো না। সেই আশংকাই এক সময় সত্যি হলো। প্রবল ইচ্ছা থাকার পরও পরিবার ও সমাজের নির্মম নিয়মের কাছে হার মানতে হয় ভারতীকে। বিদ্যা দেবী স্বরসতী ভারতীর ওপর আর সহায় হলো না। অষ্টম শ্রেণীতেই পাঠ চুকল ভারতীর।

ভারতীর যখন বই হাতে স্কুলে যাওয়ার কথা, তখন দশহাতী শাড়ী ঠিক করতে করতে সমস্ত স্বপ্ন সাধ পদদলিত করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাত্র বারো বছর বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় তাকে। শুরু হয় নতুন জীবন ।

রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার কাঁঠালবাড়ীয়া গ্রামের হরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে বিয়ে হয় ভারতীর। মা-বাবা যেন এক প্রকার কন্যা দায় থেকে মুক্তি পেতেই কোনো রকম খোঁজখবর না করেই বিয়ে দিয়ে দেয় ভারতীকে। হরেন্দ্রনাথদের অভাবের সংসার। অভাব অনটন তাদের নিত্য সঙ্গী। নতুন অতিথি ভারতী যেন বোঝার ওপর শাকের আটি। এভাবেই শুরু হয় ভারতীর স্বামীর সংসার। কোনো মতে খেয়ে পরে দিন চলে তাদের। পরবর্তী সুখের আশায় বুক বেঁধে নতুন করে লড়াই শুরু করল ভারতী। কিন্তু দিন যত যায়, সুখ যেন ভারতীর কাছে মরিচিকার মতো মনে হয়। হাল ছাড়ে না ভারতী। লড়াই চালিয়ে যায় একটু সুখের আশায়। হঠাৎ করেই বিয়ের কিছুদিন পর স্বামী হরেন্দ্রনাথ নতুন বাহানা শুরু করে। সময় অসময়ে ভারতীর বাবার বাড়ী থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দিতে থাকে। অভাব অনটনের সংসার, অন্যদিকে যৌতুক লোভী স্বামীর নিয়মিত অন্যায় অত্যাচার আর ঝগড়া বিবাদ, সবমিলে ভারতীর সংসার জীবন বিষিয়ে তুলে। যৌতুকের দাবী দিনদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। আর সেই যৌতুকের অনৈতিক দাবী মেটাতে না পারায় বিয়ের মাত্র দুই বছরের মাথায় সংসার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে গর্ভে সাত মাসের সন্তানকে নিয়ে ভারতীকে ফিরে যেতে হয় বাবার বাড়ী। মুখে কিছু না বললেও বাবার বাড়ী ফিরে আসা বিষয়টি যে তার পরিবার ভালভাবে নেয়নি সেটি বুঝতে ভারতীর মোটেও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু একটু আশ্রয় ও সন্তানের অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাকে বাবার বাড়ীতেই থেকে যেতে হয়। এক পর্যায়ে ভারতীর কোল জুড়ে আসে একমাত্র মেয়ে সুবর্না। মা মেয়ের খরচ চালাতে গিয়ে তার পরিবার নানা সময় নানা ধরণের কটূক্তি করত। এদিকে মেয়ে বড় হতে থাকে আর অসহায়ত্ব বাড়তে থাকে ভারতীর।

এরকম একটি মুহূর্তে মায়ের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে বাড়ীতে হাঁস-মুরগি পালনসহ আয়মুখী কাজ শুরু করে ভারতী এবং বিভিন্ন ধরণের কাজের সুজোগ খুঁজতে থাকে। একটি কাজ পেয়েও যায়। তার বাবার বাড়ির কাছেই ব্র্যাক এনজিওতে আইন ও মানবাধিকার সহায়তা সেবিকা হিসেবে মাসিক বেতন ৯শ' টাকার বিনিময়ে কাজ শুরু করেন। সৃষ্টি হয় আয়ের নতুন পথ।

একজন অবহেলিত, নির্যাতিত নারী হিসেবে সমাজের নির্যাতিত, নারীদের আইনী সহায়তা দিচ্ছেন, বিষয়টি ভাবতে ভারতীর ভালই লাগে। কাজটি আন্তরিকতার সঙ্গে করতে থাকেন। কাজটি করার মধ্য দিয়ে নিজের ভেতর একধরণের আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। ভারতীর ঘুরে দাড়াবার শক্তি বাড়তে থাকে। নিজেকে বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করে। শত ব্যস্ততা এবং দায়িত্বের মধ্যেও যেখানে শিক্ষনীয় কিছু হয় সেখানেই হাজির হন ভারতী।

২০০৫ সাল ধারাবারিষার পাশের ইউনিয়ন খুবজিপুরে চলছিল দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশে সেলাই শিক্ষার ওপর উন্নত প্রশিক্ষণ। সেখানেও হাজির হন ভারতী এবং কষ্ট করে তিন মাস ধরে প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তার জমানো টাকা থেকে একটি পুরোনো সেলাই মেশিনও কিনেন। এই প্রশিক্ষণই ভারতীকে ঘুরে দাড়ানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে।

সারাদিন ধারাবারিষার বিভিন্ন বাড়ী বাড়ী গিয়ে নির্যাতিত নারীদের আইনী সহয়তা দেওয়া এবং বাড়ীতে ফিরে সেলাই এর কাজ করা। গভীর রাত পর্যন্ত আশপাশের মেয়েদের সালোয়ার, কামিজ, ফ্রক ইত্যাদি তৈরি ও পরদিন কাজের ফাকে সেগুলো সরবরাহ করেন। প্রতি মাসে প্রায় ২হাজার৫শ টাকা বেশি আয় হয় ভারতীর। কাজের প্রতি তার আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখে আনসার ভিডিপি তাকে সেলাই এর ওপর একটি মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহনের সুযোগ করে দেয়। এতে করে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস ও সৎসাহস আরো বেড়ে যায় ভারতীর।

এরই মধ্যে আনসার ভিডিবি'র এক প্রশিক্ষণে একজন প্রশিক্ষক খালেদার মাধ্যমে জানতে পারে ৮ জানুয়ারি ২০১১ সাল থেকে রাজশাহীতে একটি প্রশিক্ষণ হবে। প্রশিক্ষণের কথা শুনে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জেনে রাজশাহীতে তিন দিন ব্যাপী ৬৫তম নারী নেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন কোর্স বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তার কাছে সব থেকে বেশি ভাল লেগেছে 'নারীরাই ক্ষুধা মুক্তির মূল চাবিকাঠি' ও

আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আরও মনে হয় মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে তার যেমন কিছু অধিকার আছে পাশাপাশি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। দায়িত্ব কর্তব্যের জায়গা থেকে তিনি শপথ নিয়েছেন প্রতিদিন অন্তত একটি হলেও ভালো কাজ করবে।

ভারতী তার জীবনের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন যে বাল্যবিবাহ দেওয়া ও যৌতুক দেওয়া-নেওয়া উভয়ই অন্যায়। এই উপলব্ধি থেকেই তার এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে উঠান বৈঠক, ক্যাম্পেইনসহ নানা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এলাকার যেখানেই বাল্য বিবাহ হচ্ছে বা কেউ বাল্যবিবাহ দিচ্ছে শুনে থাকলে সেখানেই তিনি ছুটে যান এবং অভিভাবকসহ এলাকাবাসীকে বুঝিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করেন। এই দায়িত্ব কর্তব্যের জায়গা থেকেই ভারতী এলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষের বিশেষ করে নারী জাতির অবস্থা এবং অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করছেন বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে।

তিনি বিশ্বাস করেন যে একজন মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হলেই কেবল অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব। তার বাস্তব উদাহরণ ভারতী রানী নিজেই। তিনি এখন স্থানীয় বিচার সালিশে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। পাশাপাশি তিনি এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মন্দির কমিটির সদস্য। ভারতীর ইচ্ছা তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন সারা জীবন লাঞ্ছনা-বঞ্চনার প্রতিবাদ করে যাবেন এবং অবহেলিত মানুষের পাশে থেকে তাদের সাহস জোগাবেন।

মমেনা বেগম ও তার কিছু উদ্যোগ

-মো: মাহমুদ হাসান রাসেল

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার ভাঙ্গামোড় গ্রামের মমেনা বেগম ভরতখালী ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য। মমেনার সাফল্যের পেছনে কাজ করেছে তার অদম্য ইচ্ছা ও কঠোর পরিশ্রম।

সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বেড়ে উঠেছেন মমেনা বেগম। সংসারে নানা অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে তাকে। বাবা নয়া ব্যাপারী একজন দিন মজুর এবং মা মইরন বেগম গৃহিণী। বাবা প্রতিদিন যা আয় করতো তাতে সংসার চালানো খুব কঠিন ছিল। তাই প্রথম শ্রেণী পাশ করার পরে আর বিদ্যালয়ে যেতে পারেনি মমেনা। সংসারে আর্থিক সহযোগিতার জন্য তাকে কাজ করতে হয়েছে অন্যের বাড়িতে। যে বাড়িতে তিনি কাজ করতেন ঐ বাড়ির মালিক মমেনার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। মমেনার স্বামীর নাম সাহেব আলী। তিনি একজন নরসুন্দর।

বিয়ের পরে সাহেব আলী মমেনাকে কিছু না বললেও তার ননদ যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে মমেনার ওপর শারিরীক নির্যাতন শুরু করে। মমেনা বেগম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কৌশলে তার শ্বশুরালয় থেকে স্বামী সন্তান নিয়ে বেরিয়ে এসে আশ্রয় নেন রাস্তার পাশের একটি সরকারি জমিতে। ছোট্ট একটি কুড়ে ঘরে স্বামী সন্তান নিয়ে অমানবিকভাবে দিন যাপন করতে থাকেন তিনি।

এই কষ্টের মধ্যেও মমেনা বেগম যখন সংসার গোছানোর চেষ্টা করছেন ঠিক তখনই শুনতে পেলেন সাহেব আলী যৌতুকের লালসায় লাইলী নামে একজনকে বিয়ে করেছেন। লাইলীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য মমেনা তার

স্বামীকে চাপ দিতে থাকেন। এরফলে, সাহেব আলী মমেনার ওপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করে । কিন্তু মমেনা হেরে যাওয়ার পাত্রী নন। অবশেষে গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে লাইলীকে তালাক দিতে বাধ্য হন সাহেব আলী।

মমেনার বিয়ে হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। তখন তার বয়স ১২ বছর। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ায় মমেনার তেমন কোনো সাংসারিক জ্ঞান ছিল না বললেই চলে। ফলে জটিলতা শুরু হতে থাকে। ইতিমধ্যে মমেনা বেগম তিন সন্তানের জননী। পর পর তিনটি সন্তান জন্ম দেওয়ার ফলে তার শরীর একে বারে ভেঙ্গে পড়ে। দেখা দেয় নানা ধরণের শারিরীক সমস্যা। স্বামীর রোজগারের যৎসামন্য টাকায় পাঁচ জনের সংসার চালনা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকটা অসহায় হয়ে পড়েন মমেনা বেগম। তিনি তখন বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে এই পরিস্থিতে তার কী করণীয়।

২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা। মমেনা জানতে পারেন পিছিয়ে পড়া গরীব মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ একটি কর্মশালা আয়োজন করে। কর্মশালার নাম গণগবেষণা। মমেনা ভিতরে ভিতরে

ভীষণ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন কর্মশালার বিষয়গুলো জানার জন্য। তিনি সেখানে যোগাযোগ করেন এবং অংশগ্রহণ করেন। গণগবেষণার মাধ্যমে মমেনা বুঝতে পারেন গরীব মানুষের মুক্তির পথ হচ্ছে একতা ও সংগঠন। একতাই শক্তি আর সংগঠনে মুক্তি। কর্মশালা থেকে ফিরে এসে তিনি তৃণমূল মানুষের মধ্যে গণগবেষণা করার লক্ষ্যে গণসংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। কারণ তিনি জেনেছেন সংগঠনেই মিলবে তৃণমূলের অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের মুক্তি। গ্রামের ২৫ জন অতি-দরিদ্র নারীদের নিয়ে গণগবেষক দল তৈরি করেন। তারা একত্রে বসেন এবং গণগবেষণা করেন। তারা গবেষণার মাধ্যমে ইউনিয়নের বিভিন্ন সমস্যা খুঁজে বের করেন। শুধু তাই নয়, যৌথ চিন্তার মাধ্যমে তারা এসব সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করেন এবং সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেন।

ভরতখালী ইউনিয়নে এই প্রক্রিয়ায় গণগবেষণা চলছে। গণগবেষণার মধ্য দিয়ে সেখানে শুরু হয়েছে সামাজিক আন্দোলন। স্থানীয় সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র মানুষ এই সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। গণগবেষণায় সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত এই দরিদ্র মানুষরা এলাকায় এখন গণগবেষক হিসেবে পরিচিত।

গণগবেষণা যৌথচিন্তাকে উৎসাহিত করে। যৌথচিন্তা এমন এক সহায়ক পরিবেশ, যেখানে সুবিধা ও অধিকারবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের নেতৃত্ব বিকশিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়, যারা সহায়ক হিসেবে পরিচিত। এই নতুন সহায়কগণই সামাজিক আন্দোলনের মুল শক্তি। বর্তমানে গণগবেষক মমেনা বেগম এমনই একজন সহায়ক। ভরতখালীতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠেছে তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন মমেনা বেগম।

এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সংগঠিত হওয়ার কারন, তাদের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজনীয়তা, নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠন গড়ার বিকল্প, গণগবেষণা চর্চার মধ্য দিয়ে সংগঠনের শক্তি চেনার উপায়, চিহ্নিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হওয়ার পাশাপাশি

বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উপায়সহ বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়েও তারা গণগবেষণা করেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করার জন্য তারা সঞ্চয় কার্যক্রম চলমান রেখেছেন। প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ জমা করেন। এই অর্থ তারা তাদের বিপদের সময় যেমন, গর্ভকালীন সমস্যা, শিশুর অসুস্থতা, আয়বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কাজে ব্যাবহার করেন।

তবে ভরতখালীতে বাল্যবিবাহ অনেক দিনের একটি প্রচলিত সমস্যা। সামাজিক কুসংস্কারের কারণে এই সমস্যা থেকে গ্রামবাসী চেষ্টা করেও বের হতে পারছিলেন না। গণগবেষক মমেনা বেগম জানান, তারা এতোদিন সমস্যাটির সমাধান করতে পারেননি, কারণ তারা সংগঠিত ছিলেন না। গণগবেষকরা যৌথচিন্তা করে খুঁজে বের করেছেন, সংগঠিত হবার পথ। এখন দরিদ্র মানুষ সংগঠিত হয়েছেন, ফলে বহুদিনের এ সমস্য সমাধান করা সহজ হয়ে উঠেছে।

বাল্যবিবাহ সমস্যাটির সমাধান করার লক্ষ্যে মোমেনা বেগম ও তার গণগবেষকদল গণগবেষণা করে প্রথমে খুঁজে বের করেন, এ ব্যাপারে আইনে কী বলা হয়েছে। জানতে পারেন, ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুসারে বাল্যবিবাহ বলতে ঐ বিবাহকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে বরের বয়স ২১ বছরের কম ও কনের বয়স ১৮ বছরের কম। এরপর যৌথচিন্তা করে তারা খুঁজে বের করেন, বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো।

বাল্যবিবাহের কবল থেকে ভরতখালী ইউনিয়নের সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর তাগিদেই মমেনা সকলকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গড়ে তুলেছেন বেশ কিছু গণসংগঠন।

কিছুদিন আগে ভরতখালী ইউনিয়নের একটি গ্রামে জোর করে ১২ বছর বয়সের একটি মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। খবরটি জানতে পেরে সাথে সাথে এই বিয়ে বন্ধ করতে ওই বাড়িতে যান। এরপর দীর্ঘসময় মেয়েটি ও যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার পরিবারকে বাল্যবিবাহের ভয়াবহতার কথা বলেন

এবং বাল্যবিবাহ আইন অনুযায়ী যে দন্ডনীয় অপরাধ তা বুঝিয়ে বলেন।এরপরও কিছু জটিলতার দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত দুই পরিবারই বয়ের আয়োজন বন্ধ করতে বাধ্য হয় ।

এভাবে গণগবেষক মমেনা যখন সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একের পর এক সমস্যার সমাধান করে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় তাদের ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে দরিদ্রদের মধ্যে চাউল বিতরণ করা হচ্ছিল। তখন ছিল রোজার মাস। সরকারিভাবে ডিলারের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে দরিদ্র মানুষের মধ্যে ১৩ টাকা সের দরে চাউল বিতরণ করা হচ্ছিল। কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন, ওই চাউল দরিদ্র মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে দেয়া হচ্ছে না এবং গোপনে ডিলাররা ব্যাপারীদেরকে চাউল দিচ্ছেন। তখন তিনি সাথে সাথে ইউনিয়ন পরিষদে যান এবং ব্যানার খুলে নিয়ে বাসায় আসেন। কিছু সময় পরে একজন ডিলার তার বাসায় আসে এবং তিনি কেন ব্যানার খুলে ফেলেছেন তা জানতে চান। ফলশ্রুতিতে গণগবেষক মমেনা জানতে চান, ৬ বস্তা চালের মধ্যে ২ বস্তা চাল দেওয়া হলে বাকি ৪ বস্তা চাল কোথায় আছে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না পেরে এবং তার কাছে মাফ চেয়ে চাউল দেওয়ার সময় মমেনাকে সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। এভাবেই ভরতখালী ইউনিয়নের নানা সমস্যা সমাধানের প্রতীক হয়ে উছেছে মমেনা বেগমের গণগবেষণার সংগঠন।

এরপর গণসংগঠনের সদস্যগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাদের মধ্য থেকে একজনকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। ইউনিয়নের সকল গণসংগঠনের প্রত্যেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মমেনা বেগমকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর। ২০১০ সালের নির্বাচনে মমেনা বেগম অংশগ্রহণ করেন এবং নির্বাচিত হন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই নির্বাচনের বিভিন্ন খরচ গণসংগঠনের সদস্যগণ সকলে মিলে বহন করেছেন। এবং এই জয়ের মধ্য প্রমাণ হলো যে, যৌথ চিন্তা ও যৌথ উদ্যোগ নিশ্চিত করে বড় শক্তি, এবং বড় শক্তি নিশ্চিত করে বড় সফলতা।

বৃদ্ধাশ্রম ও মিষ্টির গল্প

কাজী ফাতেমা বর্নালী

তিনটি ঘর। প্রতিটি ঘরে তিন থেকে চারজন নারীর বাস। শীতের শেষ বিকেলে গোল হয়ে বসে গল্প করা বসতি নারীদের মুখে বলিরেখা অস্পষ্ট হলেও আনন্দ আর স্বস্তির রেখা স্পষ্ট। সবাই পরিবার পরিজন ছাড়া; অথচ কেউই পরিবারহীন নয়। অতীত রোমন্থন, সংকট আর সম্ভাবনার গল্প নিয়ে কাটে সবার সময়। সবাই পরিবার পরিজন ছাড়া কিন্তু একধরণের অলৌকিক আনন্দ সবার মধ্যে বিদ্যমান। ঘরহীন এই নারীদের মধ্যে এই আনন্দ ছিল না। অসম্ভব যন্ত্রনার মধ্যে কাটতো তাদের দিন। কষ্টে থাকা সেই সব নারীদের জীবন বদলে গেলো যে নারীর মিষ্টি ছোঁয়ায় এবার তার কথা বলি।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানার হরিহর নগর। এই গ্রামের মনির উদ্দীন আহমেদ। পাকিস্তান আমলের বি.এ পাশ যুবক। ফুড ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব নিয়ে কুষ্টিয়ার মেহিনী মিলের কাছে আড়ুয়াপাড়াতে বসতি স্থাপন করেন। মনির আহমেদ আর নসিবা খাতুনের সংসার। সংসারটা বেশ বড়। ১৪টি সন্তান নিয়ে কাটতে থাকে তাদের দিন। তাদের সন্তানদের মধ্যে ১১তম সন্তানটির নজর খেলাধুলা নাচ-গানের দিকেই বেশি। এই জন্য শাস্তিও কমছিল না। অথচ জন্মের সময় শান্ত আর নম্র হবে ভেবে সবাই তার নাম রাখে মিষ্টি। মিষ্টির ভালো নাম আফরোজা ইসলাম।

বাংলাদেশের জন্ম আর মিষ্টির জন্ম একই বছর। অনেক ভাই-বোন হওয়ার কারণে বাইরের কারো সঙ্গে সেরকম মিশতে হতো না। নিজেদের মধ্যে খেলাধুলা করেই সময় কাটতো। যদিও খেলার জন্য প্রায়ই মায়ের কাছে শাস্তি পেতেন। ছোট বেলা থেকেই খেলাধুলা নাচ গান এর প্রতি আগ্রহ ছিলো মিষ্টির । একবার স্কুলের অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে প্রথম হলেন। তারপর প্রায়ই মনে হতো, তার নৃত্য শিল্পি বা অভিনেতা হতে পারতাম। স্কুলে যাওয়া আসা করতে করতে শিক্ষকদের দেখে নতুন ইচ্ছা বাসা বাঁধে বড় হয়ে শিক্ষক হবে। এভাবেই শান্তি আর স্বপ্ন নিয়ে চলতে থাকে মিষ্টির দিন।
মিষ্টি তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। চটপটে, চঞ্চল হিসেবে সবাই তাকে আদর

করে। বাড়ীতে বড় দুলাভাইয়ের সুত্রধরে অনেকের যাতায়াত। যাতায়াতকারীদের মধ্যে ছিলেন দুলাভাইয়ের ঘনিষ্ট এক বন্ধুও। একদিন দুমকরে বন্ধুটি মিষ্টিকে পছন্দ করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন। মিষ্টির বাবারও ইচ্ছা মেয়েদের বয়স বারো বছর পার করবে না। তাই দুলাভাইয়ের বন্ধুর আগ্রহ ও বাবার সিদ্ধান্তের কারণে মাত্র চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় বিয়ে হয়ে যায় তার। মিষ্টির শ্বশুরবাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর থানার মোমিনপুর ইউনিয়নের সরিষাডাঙ্গার বিখ্যাত মন্ডল বাড়ী। মিষ্টির স্বামী শহিদুল ইসলাম কিছুই করেন না। বিয়ের পর মিষ্টির বাবা তাকে শ্বশুর বাড়ি না পাঠিয়ে চাঁদ সুলতানা গালর্স স্কুলে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার পর মিষ্টিকে তুলে নেন শ্বশুরবাড়ীর লোকজন। ছোট বয়সে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পর অন্য জগত দেখলেন মিষ্টি।

বড় পরিবারে বিয়ের পরেও সুখের মুখ দেখা হয়নি তার। শুরু হয় শ্বাশুড়ীর কাছ থেকে নির্যাতন। কখনও কাজ, কখনও যৌতুক এই নিয়ে চলতে থাকে নির্যাতন। সে সময় যার সবথেকে পাশে থাকার কথা সেই মানুষটিও পাশে থাকেনি তার। মায়ের বাধ্যগত সন্তান হওয়ার কারণে স্বামী এই বিষয়ে কোনো কথাই বলতেন না। তাই যন্ত্রনার অবসান হয়নি মিষ্টির। এভাবে কেটে যাচ্ছিল দিন। ১৯৮৪ সালের শুরুর দিকে মিষ্টির কোলে আসে প্রথম সন্তান রনি। প্রথম সন্তান গর্ভে আসার পর ৩ মাস থেকে সন্তানের জন্ম দেওয়ার ৬ মাস পর্যন্ত মিষ্টিকে বাপের বাড়ী রেখে আসে শশুরবাড়ীর লোকজন। একদিকে সন্তান আবার অন্যদিকে নির্যাতন এই যখন অবস্থা তখন সন্তানকে রক্ষা করার জন্য মিষ্টির বাবা জামাইকে চাকরি নিয়ে দিলেন বি.এন.টি.সিতে সুপারভাইজার হিসেবে। এর পর চাকরির সুবাদে মিষ্টির সংসার শুরু হয় মানিকগঞ্জে। এখানে আসার পর প্রথম মিষ্টির মনে হলো সে সংসার করছে। অবশ্য ততদিনে দ্বিতীয় সন্তান জনির জন্ম হয়েছে।

সংসারে যখন বসন্তের মিষ্টি হাওয়া শুরু হলো তখনই আবার নতুন ঝড়ের সূচনা। হঠাৎ তার স্বামী বিদেশ যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। টাকা কিভাবে যোগাড় হবে এই চিন্তা আবার ভর করলো মিষ্টির ওপর। অবশেষে বাবার দেওয়া টাকা ও শ্বশুর বাড়ীর জমি বিক্রি করে টাকা জমা দেওয়া হলো। কিন্তু

বিদেশ যাওয়া হলো না তার স্বামীর। এভাবে তিনবার। তিনবারের মাথায় বিদেশ গেল স্বামী। এই তিনবারের যন্ত্রনায় আবার ও অন্ধকার নেমে আসে মিষ্টির জীবনে। সেই দুঃসময়ে মিষ্টি সমাজসেবা ও যুব উন্নয়নের কাজ করে আয় শুরু করেন।

স্বামী বিদেশ যাবার পর বড় ভাইয়ের ইচ্ছেতে আবার পড়াশুনা শুরু করেন মিষ্টি। ২০০০ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং ২০০৪ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে এইচ এস সি পাশ করেন। এসময় পড়াশুনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এ অংশগ্রহণ ও সামাজিক কার্যক্রম শুরু হয় মিষ্টির। ২০০১ সালে যুব উন্নয়নের সাথে কাজ শুরু করার পর ২০০৩ সালে উদয় সমাজ উন্নয়ণ সংস্থা তৈরি ও তালিকা ভুক্ত করেন তিনি। ২০০৪ সমাজ সেবা অধিদপ্তর আর ও ২০০৫ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন নেন সংস্থাটির । এভাবে কাজ করতে করতে কুষ্টিয়া শহরে একধরনের নতুন জীবন শুরু হয়ন মিষ্টির। নতুন এই জীবনই পরিচয় কারতে থাকে বিভিন্ন মানুষের সাথে।

একদিন কি একটি অনুষ্ঠানে "কথা" সমাজ উন্নয়ণ সংস্থার এনামুল হক পরিচয় করিয়ে দেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সমন্বয়কারী রাজেশ দে সাথে । তার কাছ থেকেই মূলত হাঙ্গার প্রজেক্ট ও তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা। জানা থেকে আগ্রহ আর আগ্রহ থেকেই ১১৯৮তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

এরপর কুষ্টিয়ার রুপান্তর সম্মেলন কেন্দ্র থেকে ১৫তম ব্যাচে নারী নেত্রী হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন- "আমার গড়ে উঠা বলেন সাহস বলেন সবকিছু অর্জন করেছি এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। প্রশিক্ষণের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আমি আমার কাজ গুলোকে আরো সুন্দর করে শুরু করি। "

নিজের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে শুরু হয় নতুন জীবনের যুদ্ধ। নারীনেত্রী প্রশিক্ষণ পাবার পর নারীদের সংগঠিত করে তাদের দিয়ে হাতের কাজ করাতে থাকলেন শুরু করলেন মিষ্টি। সে সময় প্রায় ২৫-২০ জন নারী তাদের সংসার চালাতো এই কাজের মাধ্যমে।

প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর নিজ তাগিদে মিষ্টি তার এলাকায় ৩টি উজ্জীবক প্রশিক্ষণ

পরিচালনা করেন। এছাড়া ১৫০ জনকে কৃষি ও ২০০ জনকে যুব প্রশিক্ষণ করিয়েছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই এখন আয় করেন। এতো কাজ করেও মনের কষ্ট যাচ্ছিল না মিষ্টির। ঐ সময় কাজের কারণে প্রায়ই গ্রামে যেতে হতো তার। গ্রামে মায়েদের কষ্ট তাকে যন্ত্রনা দিতো আর নিজের যন্ত্রনাময় সেই দিনগুলোকে মনে করিয়ে দিতো। মনে হতো এদের জন্য এমন কিছু যদি করতে পারতাম। হঠাৎ মা মারা গেলেন মিষ্টির। সালটি ছিলো ২০১০। তখন নিজেকে সান্তনা দেওয়ার কোনো রাস্তাই যেনো পাচ্ছিল না। চলমান যন্ত্রনার সাথে যুক্ত হয় নতুন যন্ত্রনা। সেই যন্ত্রনা থেকে বাঁচার জন্য ২০১১ সালে শুরু করেন উদয় পরিচালিত 'বৃদ্ধাশ্রম'।

প্রথম ৫ জন মাকে নিয়ে শুরু হয় বৃদ্ধাশ্রমের যাত্রা। এসময় আশ্রমে রাখেননি কিন্তু সব প্রকার সহযোগিতা করেছেন আরো ২২ জন মাকে। বর্তমানে মিষ্টির আশ্রয়ে ২৭ জন মা আছেন। এর বাইরে সহযোগিতা করেন আরো ১৫০ জন মাকে। প্রথম যখন কাজটি শুরু করেন তখন অনেকেই বিষয়টাকে বাকাচোখে

দেখেছেন। সহযোগিতাও জোটেনি ঠিকমতো কিন্তু মিষ্টির আগ্রহ ও চেষ্টা কাজটাকে বন্ধ হতে দেয়নি।

কাজের কারণে যে সকল গ্রামে মিষ্টি যেতেন সেখান থেকেই প্রথম প্রথম মায়েরা আসতো। এখন জেলার গন্ডি ছাড়িয়ে বাইরের জেলা থেকেও মায়েরা আসে। কোনো মাকেই চিরদিন এখানে রাখার পক্ষে নন মিষ্টি। তার মতে,'মা যদি কিছুদিন বাড়ীর বাইরেও থাকে ঐ পরিবার, পরিবারের সদস্য, সন্তান এমনকি মা নিজেও পরিবারের অভাব বোধ করবেন। এবং মা ফিরে যাবেন তার সন্তানের কাছে। এমন ঘটনাও ঘটেছে গোটা পাঁচ ছয়। সন্তানরা এসে কান্নাকাটি করে আবার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন।

দিনে দিনে বাড়ছে মায়েদের সংখ্যা আর ব্যায় বাড়ছে মিষ্টির। এখন মাসে প্রায়ই ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হয় মিষ্টির। নিজের স্বামী, দেশের বরেণ্য মানুষ, স্থানীয় গণ্যমান্য মানুষ, মিষ্টির পরিবার আর মিষ্টির শ্রমের টাকা দিয়ে এভাবেই চলছে বৃদ্ধাশ্রমটি। মিষ্টি নিজেও জানে না আর কতদিন এভাবে চলবে কিন্তু পথচলা থামেনি তার।

মিষ্টির স্বপ্ন তার নিজের বৃদ্ধাশ্রমটি বৃদ্ধাদের অভয়াশ্রম করতে চান। তাদের মানসিক সহযোগিতা করা এবং পরিবার ভুক্ত মানুষগুলোর মধ্যে পরিবার প্রথা আবার ফিরিয়ে দিতে চান। মিষ্টি কোনো সময় চাননা সেখানে কোনো মা আর আসুক কিন্তু যে মায়েরা আসছে তাদের জন্য তৈরি অভয়াশ্রমটিকে পরিণত করতে চান দেশের বড় আশ্রম হিসেবে। স্বপ্ন দেখেন বিশাল জায়গার উপর নির্মিত হবে তার আশ্রম। এদেশের মানুষ অনেক ভালো কিছুর সাথে যুক্ত হয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ভালো কাজ কিভাবে করতে হয়। মিষ্টি আশাভরা মন নিয়ে অপেক্ষায় আছেন কবে আপনার সহযোগিতা মিষ্টিকে আরো এগিয়ে দেবে তার স্বপ্ন পূরণে।

শাহানাজ পারভীন : একজন সফল উদ্যোক্তা

নিয়াজ মোর্শেদ

একজন মানুষের অসামান্য সাফল্যের পেছনে তার মেধা-মনন ও নিরলস পরিশ্রম থাকা একান্ত জরুরি। একই সঙ্গে সামনে এগিয়ে যাবার পথে সকল ধরণের বাধাঁকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতাও তাকে অর্জন করতে হবে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার ক্ষেত্রে এই আদর্শগুলো থাকা আবশ্যক। কথাগুলো আমরা হরহামেশাই আমাদের গুরুজনদের কাছে শুনে থাকি। কিন্তু বাস্তবে পুরোপুরি প্রতিফলন হাতে গোনা কয়েকজনের দ্বারাই শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়। তাদের মধ্যে বরিশালের হিজলা উপজেলার গোয়ালবাওর গ্রামের শাহানাজ পারভীন একজন।

শাহানাজের জন্ম ১৯৬৪ সালে। মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান শাহানাজের শৈশব কেটেছে গোয়ালবাওর গ্রামে। ১৯৬৯ সালে হঠাৎ করে ভয়াবহ বন্যায় সীমাহীন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় শাহানাজের পরিবারকে। এরপর তার বাবা স্বপরিবারে বরিশালের সদর উপজেলায় স্থানান্তরিত হোন । এরপর সেখানেই মা-বাবার অনুপ্রেরণায় স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা শুরু করেন তিনি।

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন আর দশজনের মতো শাহানাজেরও ছিল। ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে নিজ উদ্যোগে ১৯৮৬ সালে ছয় মাসের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন ধরণের হাতের কাজ ও টেইলারিং এর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন শাহানাজ। তখন তিনি কলেজে পড়াশুনা করছিলেন। প্রশিক্ষণ এর সময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যাতায়াত ভাবার জন্য প্রাপ্ত টাকা ও পরিবারের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে হাতের কাজ করে বিভিন্ন মেলা ও বুটিক শপে তিনি সরবরাহ করতেন। এইসকল কাজের পাশাপাশি পড়াশুনাও চালিয়ে যান শাহানাজ। ১৯৮৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর ডিগ্রি পাশ করতে ভর্তি হন বি.এম কলেজে। এভাবে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে খুব খারাপ কাটছিল না শাহনাজের জীবন।

হঠাৎ করেই ১৯৮৯ সালে পরিবারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নজরুল ইসলাম নামের একজন মোটর পার্স ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেন শাহানাজ। জীবনের সবথেকে রূঢ় বাস্তবার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বিয়ের প্রায় বাইশ দিন পর। শাহানাজ জানতে পারেন যে তিনি তার স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী। এরপর তিনি একমুহূর্তও এই অন্যায় মেনে না নিয়ে বাবার বাড়ি ফিরে যান। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে পরিবারের সবাই তাকে আবারও বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে ক্ষুব্ধ হন তিনি। এই পরিস্থিতিতে শাহানাজ হঠাৎ করে ঢাকায় বিশ্বরোড কুড়িল এলাকায় তার বড় ভাইয়ের কাছে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাইয়ের বাসায় কিছুদিন অতিবাহিত করেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর তিনি আবার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ খুজতে শুরু করেন। রাজারবাগ পুলিশলাইন স্কুলে সহকারি শিক্ষিকা পদে যোগদান করেন। তিন বছর ধরে সম্মানের সঙ্গে স্কুলে চাকরি করছিলেন শাহানাজ। ভালোই চলছিল তার জীবন।

এরমধ্যে তার স্বামীর সঙ্গে আবারো যোগাযোগ হয়। স্বামীর মনভুলানো

কথায় তার সঙ্গো শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হন শাহানাজ। ফলে চাকরিটিও ছেড়ে দিতে হয় তাকে। কিছুদিন স্বামীর সঙ্গো সুখেই ছিলেন তিনি। এরপর শাহনাজের ওপর শুরু হয় অমানুষিক নির্যাতন। নিরবে সহ্য করেছেন শুধু একটি আশা নিয়ে যে সন্তান হলে হয়তো সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

১৯৯৩ সালে কন্যাসন্তানের মা হোন শাহনাজ। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় দুর্দশা আরো চরম পর্যায়ে রূপ নিতে থাকে। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে নিজের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে স্বামীর সংসার ছেড়ে ১৯৯৬ সালে আবারো রাজধানী ঢাকায় গিয়ে বেঁচে থাকার যুদ্ধে নামেন তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্য তার সঙ্গো পরিহাস করেনি। নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন 'ঢাকা সেভিংস'-এ চাকরি লাভ করেন শাহনাজ। প্রায় দেড় বছর সংগঠনে কাজ করার পর ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বরিশালের কাশীপুর ইউনিয়নে তার নানার বাড়িতে চলে যান। এরপর নিজ এলাকার নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে কাশীপুর ইউনিয়নে ৩৫জন নারীদের সঙ্গো নিয়ে চাকরির কিছু জমানো টাকাকে পুঁজি করে গড়ে তুলেন একটি সংগঠন। নাম রাখেন 'পল্লী জন উন্নয়ন সংস্থা'। সমাজসেবার কাজের পাশাপাশি ২০০০সালে 'ভোস্ট' নামে একটি এনজিওতে প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন তিনি। ২০০৩ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন উন্নয়ন সংগঠনে। এরপর মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে একটি প্রজেক্টে কাজ শুরু করেন শাহানাজ। কঠোর পরিশ্রম আর প্রবল আত্মশক্তি তার দুঃস্বপ্নের দিনগুলোকে আর স্মরণ করতে দেয়নি।

এই প্রয়াসকে আরো এক ধাপ এগিয় নিতে উৎসাহিত করেছিল দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ। ২০০১ সাল থেকে তিনি হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন কার্যক্রমরে সঙ্গো জরিত ছিলেন।

২০০৩ সালে শাহানাজের স্বপ্ন পূরণ হয় সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে 'পল্লী

জন উন্নয়ন সংস্থার' রেজিস্ট্রেশন করার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে প্রায় ৬শ'৫০জন সদস্য রয়েছে সংস্থাটিতে। শাহনাজ পারভীন নির্বাহী প্রধান হিসেবে এখাঁনে দায়িত্ব পালন করছেন। মূলত সেবামূলক সংগঠন হিসেবে এই সংস্থায় দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, বিনামূল্যে অসহায় নারীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

২০০৬ সালে চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি মননিবেশ করেন সমাজ সেবামূলক কাজে। ২০০৭ সালে তার উদ্যেম আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণে জেন্ডার, নারীর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করেন তিনি। এরপর ২০০৮ সালে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ৪দিনের প্রশিক্ষণে সবথেকে ভালো লাগে ব্যানারে লেখা 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না' এই লাইনটি। প্রশিক্ষণে দশটি নীতিমালা শাহানাজের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলে। প্রশিক্ষণ শেষে শাহানাজ অনুধাবন করেন যে নারীদের সকল অন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় 'পল্লী জন উন্নয়ন সংস্থার' পক্ষ থেকে নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সেলাই, ব্লক, বিভিন্ন ধরণের শো পিস তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সংগঠনটির মাধ্যমে প্রায় ৪শ' জন নারীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শাহনাজের তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ২ জন করে প্রশিক্ষক কর্মরত রয়েছে। এছাড়াও তিনি কাশীপুর বাজারে 'শাহানাজ বুটিক এন্ড টেইলার্স' প্রতিষ্ঠা করেছেন ২০১০ সালের জানুয়রি মাসে। এরজন্য অগ্রণী ব্যাংক বটতলা শাখা থেকে ৫০ হাজার টাকা মহিলা উদ্যোক্তার লোন নেন তিনি । বর্তমানে নিজের বুটিক শপ আর টেইলারিং-এর কাজ করে মাসিক প্রায় ২০ হাজার টাকা তিনি আয় করেন ।

শাহানাজের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অনেক নারীই সমাজে মাথা উঁচু করে বাচঁতে শিখেছে। নিজের পায়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন। একজন সফল উদ্যোক্তা ও স্বাবলম্বী নারী হেসেবেই নয় গর্বিত মা হিসেবেও প্রশংসার দাবি রাখেন শাহানাজ। ২০১১ সালে মেয়ে শামীমা নাজনীন নোয়খালী সরকারি মেডিকেল এ ভর্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হোন।

এখানেই শেষ নয় সফল উদ্যোক্তা শাহানাজ পারভীনের গল্প। তিনি বরিশাল সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে নারীদের সচেতন করেন। তিনি বলেন, ''ঘরে বসে না থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন।''

প্রবল আত্মশক্তি একজন মানুষের স্বপ্ন পুরণের পথে যে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে তার জ্বলন্ত সাক্ষী শাহানাজ পারভীন। এর ফলে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে সামনের দিকে হাঁটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। তবে বাধা হয়ে যে সমস্যাগুলো এই প্রয়াসকে দমিয়ে রাখতে চায় তা অনেকটা ক্ষণস্থায়ী শক্ত করে হাল ধরলে কেউ তাকে রুখতে পারবে না। তার উজ্জল দৃষ্টান্ত শাহানাজ পারভীন।

সালেহার সংগ্রাম ও সাফল্য

মো: আসলাম খান

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সাহসী উদ্যোগ নিয়ে একজন নারীর সামনে এগিয়ে চলা সত্যিই চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার সাহস যে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেন সেই সফল। এমন একজন সাহসী নারীর নাম মনোয়ারা আফরোজ সালেহা। ছোটবেলা থেকে সালেহার স্বপ্ন ছিল উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একজন আদর্শ শিক্ষক হবেন এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন।

১৯৬৯ সালে চরনিলক্ষিয়া ইউনিয়নের শল্কগঞ্জ রঘুরামপুর কুমারীকান্দা গ্রামে সালেহার জন্ম। পিতা ইসলাম উদ্দিন কৃষিকাজের সূত্র ধরে থাকতেন নেত্রকোনায়। নিজ জমিতে ফসল উৎপাদনই ছিল তাঁর প্রধান পেশা। মা মোছা: মর্জিনা খাতুন ছিলেন গৃহিণী। দুই ভাইবোনের মধ্যে সালেহা ছিলেন বড়। সংসারে একমাত্র মেয়ে হওয়ায় আদর যত্নের কমতি ছিল না তার। মা-বাবার ইচ্ছা ছিল মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করবেন। কিন্তু, বাস্তবতা মানুষের জীবনের অনেক ইচ্ছাকেই পূর্ণ হতে দেয় না। সালেহার ক্ষেত্রেও তেমনটি হয়েছিল। অনেক সংগ্রাম করেও উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হতে পারলেও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করার স্বপ্ন তিনি পুরণ করেছেন নিজ প্রতিভা ও চেষ্টায়।

১৯৭৩ সালে হঠাৎ করেই সালেহার বাবা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অনেকটা পাগলের মতো হয়ে যান। পরবর্তীকালে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৬ সালে মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর তার মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হলো। মনে হচ্ছিল জগৎ সংসারে তার থেকে অসহায় আর কেউ নেই। বাবার মৃত্যুর পর মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। মাত্র ৬ বছর বয়সে সালেহার ছোট ভাই মারা যায়। ছোটভাইয়ের মৃত্যুর পরে সালেহার যেন আর খেলার সাথী কেউ থাকলো না। মানসিক কষ্টে সালেহার দিন কাটতে থাকে। ছোটবেলা থেকেই বিয়োগান্ত ঘটনা তার জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। বাবার মৃত্যুর পর শুরু হয় আর্থিক টানাপোড়েন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য

দুঃসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় লাভ করতে হয় সালেহা ও তার মাকে। সেখানেই চলতে থাকে তাঁর জীবন সংগ্রাম। অনেক সংগ্রাম করে তাকে পড়াশুনা করতে হয়।

সালেহার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার গোয়ালকান্দা নূরুল উলুম খারেজী মাদ্রাসায়। ১৯৮১ সালে তিনি ময়মনসিংহের ফুলপুরের গিটুয়ারী দাখিল বালিকা মাদ্রাসা থেকে দ্বিতীয় বিভাগে দাখিল পাশ করেন।

ভেবেছিলেন দাখিল পাশের পর চাকরির ব্যবস্থা করে সংসার পরিচালনা করবেন ও কলেজে ভর্তি হবেন। ১৯৮৭ সালে সালেহার চাচাতো ভাই মোকাম্মেল হক চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে চট্টগ্রামে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রতি পদে পদে তাকে বাঁধাগ্রস্থ হতে হয়েছে। চাকরির প্রত্যাশা দিয়ে তার চাচাতো ভাই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এরপর সালেহার অনিচ্ছা থাকা সত্বেও উভয় পরিবারের সম্মতিতে চট্টগ্রামেই মোকাম্মেল হক এর সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন হয়।

অনেককিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে নতুন জীবনে প্রবেশ করতে হয়। শত ইচ্ছা থাকার পরও নানা প্রতিকূলতার কারনে সালেহার আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। তবে নিজেকে স্বাবলম্বী করার ইচ্ছায় ১৯৯০ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে এক বছর মেয়াদী সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

চলতে থাকে সালেহার সংসার। পড়াশুনা না হলেও চাকরি করার সুযোগ হয় সালেহার। ১৯৯৪ সালে ব্র্যাক এন.এফ.পি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। এভাবে কিছুদিন ভালোই কাটছিল সালেহার জীবন। হঠাৎ করে আচমকা ঝড় এসে আঘাত হানে সালেহার জীবনে। বিয়ের সময় মোকাম্মেল হকের মা যৌতুক দাবি করলে সালেহার পরিবার রাজি হননি। সেই জের ধরেই সালেহার বিরুদ্ধে নানারকম মিথ্যা অভিযোগ করে মোকাম্মেলকে প্ররোচিত করা হয়। এর রেশ ধরেই মোকাম্মেল নির্মমভাবে শারীরিক নির্যাতন করে সালেহাকে রেল লাইনের ওপরে ফেলে রেখে যায়। এরপর প্রতিবেশীরা রেললাইন থেকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সুস্থ হয়ে সালেহা স্বামীসহ পরিবারের লোকদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার রায়

সালেহার পক্ষে আসে। তারপর পারিবারিকভাবে মীমাংসার মাধ্যমে সালেহা আবার স্বামীর সংসারে ফিরে যান।

এই ঘটনার সম্মুখীন হয়ে সালেহা সমাজে নারীদের দুরাবস্থাটা উপলব্ধি করেন। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীদেরকে সংগঠিত করে কাজ করার পরিকল্পনা করেন। আত্মকর্ম সংস্থান ও সামাজিক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ২০০৫ সালের মে মাসে শাপলা সমবায় সমিতি গঠন করেন। বর্তমান সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৫ জন। মাসিক ১০ টাকা সঞ্চয় করে সমিতির পুঁজি বর্তমানে ৩০ হাজার টাকা। অসহায় দুস্থ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার দাফনের ব্যবস্থা সমিতির মাধ্যমে করা হয়। এছাড়া, দরিদ্র পরিবারের কোনো মেয়ের বিয়ে দিতে সমস্যা হলে, তাকে আর্থিক সহায়তা করা হয়। মূলত সমিতিটি বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সমস্যা নিয়ে কাজ করে। এলাকার বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক নিয়ে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পাশাপাশি এলাকার মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। নারী নির্যাতন বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে সালেহা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এরই সূত্র ধরে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য শাহিনুর এর মাধ্যমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণের কথা জানতে পারেন। এরপর ২০০৬ সালে ৯শ'৩৪ তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন সেশনটি তাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

প্রশিক্ষণ শেষে তিনি দু:স্থ অসহায় শিশুদের নিয়ে রোজ কিন্ডারগার্টেন স্কুল চালু করেন। সালেহা প্রত্যাশা করেন কেউ যেন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়। সম্পূর্ন স্বেচ্ছাব্রতী উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলটিতে সালেহা প্রধান শিক্ষক হিসেবে এ স্কুলের দায়িত্বে আছেন। তাছাড়া আরও তিনজন শিক্ষক আছেন । এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ জনেরও অধিক ছেলেমেয়েকে বিনামূল্যে পাঠদান করা হয়েছে। যদিও স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় প্রত্যেক শিশুকে ২০০ টাকা করে বাৎসরিক ফি জমা নেওয়া হয় তবে এটি বাধ্যতামূলক নয়।
ব্রাকের এন.এফ.পি. স্কুলে শিক্ষকতা করে যে টাকা তিনি সঞ্চয় করেছেন

সেই টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করেন। ২০০৭ সালে তার ক্রয় করা ৮৩ শতাংশ জমিতে চাষাবাদ করে মাসিক ১০হাজার টাকা আয় হয়।

সালেহা ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক আয়োজিত ৫১তম নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গির আরও পরিবর্তন হয়। ভাবেন নারীরা যদি ক্ষমতায়িত হয়, তাহলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। প্রশিক্ষণ থেকে তার এই উপলব্ধি হয় যে, এই ধরণের প্রশিক্ষণ বাংলাদেশের সব নারীর করা দরকার। প্রশিক্ষণ শেষে এলাকার বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যেন সালেহার নেশায় পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যে সাবিন, হালিমা রুমাসহ আরও অনেক মেয়ের বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছেন তিনি। এলাকার মানুষকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি বাড়ছে জনসচেতনতা। অভিভাবক সভা করে এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির ফলেই এটা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, তিনি ৫০ জনকে বিনা টাকায় সেলাই প্রশিক্ষণের কাজ শিখান।

সালেহা তার এলাকার অবহেলিত, বঞ্চিত, অসহায় নারী ও শিশুদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি নিজস্ব চিন্তা-চেতনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। সভা, সমাবেশ, র‍্যালি, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তিনি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণে প্রণোদিত করে চলেছেন। আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সদস্য হিসেবে নির্বাচন করার স্বপ্ন দেখছেন সালেহা। সদস্য নির্বাচিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে মেয়েদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বন্ধ কুটির শিল্প ও বৃদ্ধ মহিলাদের বাস্ত বসম্মত পরিকল্পনার মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠা করার আশা করছেন তিনি।

২০১০ সালে রঘুরামপুর টানাপাড়া গ্রামটিতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৮ ভাগ। এই দুরাবস্থা দেখে সালেহা এ বিষয়ে কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামের প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় ছেলে-মেয়ে ও অভিভাবকদের উঠান বৈঠক, সভা, সেমিনার, র‍্যালী, নাটক

প্রভৃতি সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তার গ্রামের লোকদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলেন। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ স্বাস্থসম্মত পায়খানা ব্যবহার করেন ও স্যান্ডেল পড়ে পায়খানা ব্যবহার করেন। এছাড়া আগে যেখানে খোলা পায়খানা ছিল, সেখানে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে রঘুরামপুর থেকে বাজিতপুর সরকার পাড়া পর্যন্ত আধা কিলোমিটার তার মাধ্যমেরই শতভাগ স্যানিটেশনের আওতায় এসেছে।

সালেহা এখন চরনিলক্ষিয়া ইউনিয়নের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। কাজ করতে গিয়ে আগে এলাকার লোকজন তাকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করতো কিন্তু এখন আর কেহ সেটা করে না। পারিবারিক ও সামাজিকভাবেও তাকে সবাই সাহায্য করে। তিনি আরও বলেন, আমি এখন কাজ করতে পারি। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হবার কারণে সমাজে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। দু:স্থ শিশু ও নির্যাতিত মহিলাদের কাজের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। যার মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সকল অশুভ শক্তিগুলোকে পরাজিত করে গঠিত হবে- নারী পুরুষ বৈষম্যহীন একটি নতুন সমাজ। বর্তমানে রোজ কিন্ডারগার্টেন পরিচালনা করার পাশাপাশি ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স এর কালেক্টর হিসেবে কাজ করেন সালেহা। এছাড়া, বিভিন্ন সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত রয়েছেন সালেহা। অসহায় নারী ও শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আত্মপ্রত্যয়ী নারীনেত্রী মনোয়ারা আফরোজ সালেহা।